একদা নবমী নিশি

— সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী
কোলকাতা।

ভোরবেলায়, আলো ফুটেছে কি ফোটেনি, ঢাকের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় বালকের। কিন্তু এখন কি ওঠা যাবে? নাহ! চোখ বুজে স্পষ্ট দেখতে পায়, প্যান্ডেলে পৌঁছে গেছে ধনু, মৃণাল, বাবুয়ারা। সবার বাবা-মা ছাড় দেয়, যত বাড়াবাড়ি ওর বাবামায়ের। বাবার। মনের ভেতরে গজগজায় বালক।

বছর দুয়েক হয়েছে তখন, রমেশ স্কুলের ঠিক সামনে, স্কুল-চৌহদ্দির মধ্যেই দুর্গা পুজো হচ্ছে। স্কুলের পুজো নয়, বলা যায়, এলাকার বা পাড়ার প্রথম পুজো। সে এক মস্ত ব্যাপার। আর ওই পুজোর ঠাকুর গড়ছেন যিনি, তিনি তো পেছনের বাড়ির নবদ্বীপকাকু। মূর্তি গড়াটা তাঁর পেশা নয়। বিচিত্র প্রতিভার একটি মুখ। তিনি স্কুলেরই মাস্টার মশাই। স্কুল ঘিরেই ওই পাড়া। নবদ্বীপকাকু বা তার বাবার মতো কয়েকজন মাস্টারমশাইয়ের বাস। তার বাইরেও অনেকে থাকেন অবশ্য, কিন্তু কোনও -না-কোনও ভাবে স্কুলের সঙ্গে যেন জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছেন তাঁরাও। তো পুজোর গন্ধটা একটু আগেভাগেই পেয়ে যেত সেই বালক। সেই সলতে পাকানো, না না, বাঁশ-খড়ের কাঠামো পাকানোর কাল থেকেই। তারপর একরকম চোখের সামনেই পড়তে থাকে মাটির প্রলেপ, দিনে দিনে ফুটে ওঠে ডৌল। মহালয়া পেরিয়ে যায়। ধর-মুণ্ড জুড়ে রঙের আলোয় গন্ধে বিভাময় হয় রূপ। আর তখনই মালুম হয়, পুজোটা এসেই গেছে। বালকের আপন অঞ্চল থেকে এবার ঠাকুরের যাত্রা সর্বজনীন মঞ্চ। মণ্ডপে। সেখানেই ষষ্ঠীর বিকেলে চোখ ফোটে প্রমির। সন্ধ্যে নামতে না নামতেই ফিরতে হয় বাড়ি। সপ্তমীর ভোরে বাদ্যি বাজে, কখন যাবে বালক? হ্যাঁ, সাত সকালে পুজোর ফুল তোলা সারা হলে একটি চক্কর সে ঠিকই মেরে আসে। কিন্তু সেবার এক কাণ্ড হল। ওই পুজো মণ্ডপে যাওয়াই বারণ হয়ে গেল। ষষ্ঠীর বিকেলে পাড়ার বন্ধুরা যখন ভিড় করছে প্যান্ডেলে, সেই বালক খেলার মাঠ থেকে মুখ চুন করে ফিরে এল বাড়িতে। সপ্তমীর সকালেও বাড়িতে মুখ গুজে রইল। বাবার ওই ফরমানের কারণ? চাঁদা। পাড়ার দাদারা নাকি বেশি টাকা চেয়েছে, বাবা যা দিতে চাইল, তা অবার ওরা নেবে না। চলেই গেল না নিয়ে। বাবার আঁতে লাগল, ছেলেগুলো সব 'মস্তান' হয়ে গেছে। যেতে হবে না এই পুজোয়। বোঝো!

তা মস্তানির একটা জবরদস্ত কালচার যে ছিল তখন, সে কথাটা মিছে নয়। সাতের দশকের গোড়াকার কথা। মস্তানদের একটু ভয়ডর করা, মন্যিগন্যি করার ব্যাপার ছিল। লোকাল হিরো একেকজন। তাদের কীর্তিকথা নিয়ে রোমহর্ষক সব গল্প কানে আসত। ক্লাবে ক্লাবে রেষারেষি, মারপিট — জমজমাট সব কাণ্ড। পুজো ঘিরে, বিশেষত বিসর্জনের সময় একটু বেশিই জমে উঠত সেসব। বিসর্জন দেখতে যাওয়া বারণই ছিল সেই পরিবারে। ভদ্দরলোকের ছেলেদের নাকি ওসবে যেতে নেই! কত যে বারণ! মুখ ফুটে তো বলা যায় না, সেই বালকেরও একটু সাধ হত মস্তান হওয়ার। কিন্তু সে কি সহজ ব্যাপার? হুঁ হুঁ, তার জন্য বডি বানাতে হয়। মাস্‌ল বানাতে হয়। বাহার থাকতে হয় পোশাকের, চুলের। না দেখা হিন্দি সিনেমার হিরোদের মতো। ঘাড়ের ওপর উঁচিয়ে থাকবে বক্রম - ওলা কলার, দু'খানা বোতাম খোলা থাকবে জামার, আর চিতিয়ে থাকবে প্রশস্ত বুক — সে কি আর অমনি অমনি হয় রে বাপু! সাধনা চাই, আয়োজন চাই। নিজের রোগা- ভোগা দেহখানার দিকে তাকিয়ে আশাভরসার তেমন লক্ষণ দেখতে পেত না সে। তার পুজোর জামাকাপড়েরও যা ছিরি! চলতি ফ্যাশনকে সিকি পয়সার খাজনা দেবেন না বাবা। অতএব ফি বছর সেই বাঁধা দর্জি ঊষাকাকুর বানানো সুতির ঢোলা প্যান্ট, সাবেক ছাঁটের ঢলঢলে জামা, নেতিয়ে থাকা কলার। আর মাথায় প্রায় খাড়া খাড়া হয়ে থাকা চুল। এ আবার হবে মস্তান! ধুস!

ছোট্ট ওই শহরটাতে তখন অনেক অনেক পুজো হত, তা তো নয়। জগন্নাথ দিঘীর তিন কোণে রবীন্দ্র সঙ্ঘ, বিবেক সংঙ্ঘ, টাউন হলের পুজো। বাজারের দিকে এগিয়ে গেলে ধর্মাশ্রম। এছাড়া আরও দুয়েকটি মণ্ডপ। হ্যাঁ, অমর সাগরের ওদিকে প্রগতি সঙ্ঘের ঠাকুরও তখন নাম করছে। একটি সন্ধ্যার জন্য ওইগুলোই অনেক। স্কুল বোর্ডিংয়ে থাকা কোনও দাদার সঙ্গে একদিন সন্ধ্যায় শহরের পুজোগুলো দেখতে বেরনো যেত। অন্য সন্ধেগুলোয় স্কুল

চত্বরের পুজোয় পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে হইহই করা। সম্ভব হলে একটু আধটু মাতব্বরি। এবার সেসব বন্ধ? পুজো মানে তবে নিষেধের কঠিন এক বেড়ি? নিষেধটা কিন্তু উঠে গিয়েছিল সপ্তমীর সকালেই। যেভাবেই হোক, কথাটা পৌঁছে গিয়েছিল ওই পুজোর কর্তাদের কানে। এবাড়ির দুটি ছেলে ওই পুজোয় না গেলে কারও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হত না। কিন্তু উৎসবের সকালে কোথাও হয়তো জেগে উঠল 'ধর্মবোধ'। 'মধুরেণ' ব্যপারটা হয়তো সংসারের লেনদেনে সত্যিই তাহলে অলীক নয়। বাড়িতে বাবার সপ্তমীর পুজো বোধহয় তখন সাঙ্গ হয়েছে, দুতিনজন দাদা এসে হাজির। 'স্যর, চন্দন-নন্দরে আমরার পূজায় যাইতে মানা করছেন আমনে? ইডা একটা কথা হইলনি?' মিটে গেল জট। বাবা চাঁদা দিলেন, দাদারা হাসি-হাসি মুখে নিলেন, দুই ছেলের বুক থেকে পাথর নেমে গেল। ছোট ছেলেটাই একটু বেশি হুজুগে। তিড়িং করে মেলে দেয় ডানা। চরাচর মুহূর্তে মধুময়। মধুময় শরতের আলোহাওয়া।

এই তো বেশ! কম-বেশি পাঁচ দশক বাদে স্মৃতির অমল ধবল পালে এরকমই তোমধুর হাওয়া লাগার কথা। আর এখানেই যদি কথাটি ফুরোয়, বেশ হয়। তবু ধন্দ জাগে, শৈশবের সবটুকুই কি অমল ধবল? নিষেধ উঠে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই সেই বালক যথারীতি এবেলায় ওবেলায় টুঁ মেরেছে প্যান্ডেলে। রাত আটটা সাড়ে আটটা বেজে গেলে মন একটু ভারী হয়ে উঠত, ফিরতে হবে, এবার ফিরতে হবে বাড়ি। কিন্তু তার আগে প্রতিটি মুহূর্তের স্বাদ যতটা সম্ভব চেটেপুটে নেওয়া। এভাবেই খসে যায় একটি একটি করে তিথি। তারপর নবমী। পরদিন ভাসান দেখতে যাওয়ার প্রশ্ন নেই, অতএব, এই তার শেষ রজনী। মেতে উঠেছে সে বন্ধুদের সঙ্গে। আঙুলের ফাঁকে লুকনো হাতিয়ার— ছোট্ট একটি পিন বা কাঁটা। বড়দের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে আসা বাচ্চাদের বেলুন ফুটো করে দিচ্ছে নিরীহ মুখে। তারপরই নিজেদের মধ্যে গোপন উল্লাস, কে ক'টি বেলুন ফাটিয়ে দিতে পারল তার খতিয়ান। এরকমই একটি সফল অপারেশনের পর মসৃণভাবে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাচ্ছিল সেই বালক। মিশে গেলেও। পেছন থেকে কিন্তু তাড়া করল ভ্যাঁ করা কান্না। বাচ্চাটি কেঁদেই চলছে, নিতান্তই সাদামাটা চেহারার অসহায় মা তাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন, হয়তো আরেকটা বেলুন কিনে দেওয়া সেই মায়ের পক্ষে একটু বেশিই বিলাসিতা। গুপ্তঘাতকের মতো পালিয়ে গেল সেই বালক। কেউ জানতে পারল না, ধরতে পারল না। জাপটে ধরল শুধু নাছোড় এক কান্না। নবমী নিশির চেনা বিষাদের অতিরিক্ত কোনও বোঝা নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরতে হল। তারপর এর ছায়া নীরবে দীর্ঘ হল। হতে হতে কখন তা ঝাপসা করে দিল পুজো দেখার আহ্লাদ, ভাসানে যাওয়ার অপূর্ণ সাধ, মস্তান হওয়ার বাসনাকে। হয়তো অগোচরেই শুরু হয়ে গেল বড় হওয়ার বেদনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ।

অনি

— কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী
আগরতলা।

অনিকে চিনি বহুদিন। সেই যখন ছোটবেলায় আমি স্কুলে যেতাম, অনি আমার সাথে থাকত। আমার থেকে কিছুটা ছোট কিন্তু খুব বন্ধু আমার। মাঝে মাঝেই ঝগড়া হত আমাদের। অনি আর কথা বলত না। আমাকেই আবার একা একা স্কুল যাবার পথে ওদের বাড়ীতে উঁকিঝুকি দিতে হত। আমি শুনতাম বাইরে থেকে, অনি গান গাইছে - ''আনন্দলোকে, মঙ্গলালোকে, সত্য সুন্দর''। খুব ভাল গাইত। বরাবরই ক্লাশে ভাল রেজাল্টও করত। প্রথম তিনজনের মধ্যে ওর জায়গা নিশ্চিত। ওদের বাড়ীটা ছিল অদ্ভুত এক বাংলোর মত। গেলেই মন জুড়িয়ে যেত। জুঁই, হাসনুহানা আর চাঁপা ফুলের মাতাল করে দেওয়া অপূর্ব সুগন্ধ। মা বলতেন তীব্র সুগন্ধে নাকি সাপ চলে আসে। তবে আমার অত ভয়-ডর ছিলনা। একটা সাপকে তো একবার নালার মধ্যে দুটো কাঠি দিয়ে চেপে ধরেছিলাম। পাশের কোয়ার্টারস এর কাকীমা আর উল্টোদিকের বোস কাকিমা দৌড়ে এসেছিলেন। কোন মতে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে মা-র হাতে দিয়ে বল্লেন - বৌদি, কী দস্যি ছেলে আপনার! অনি সব শুনে বলল - ''তুই এগুলো কেন করিস? তোর যদি কিছু হয়ে যায়?''

আমি হাসতাম। আর সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে অনিকে বসিয়ে চলে যেতাম গোবিন্দপুর কলেজ মাঠ, আশ্রম স্কুল। তখন ভরদুপুর। স্কুল একটার মধ্যে শেষ। একটু কিছু খেয়ে নিয়েই বেড়িয়ে পড়তাম। একদিন সাহস করে বললাম - ''চল অনি, আমরা এয়ারপোর্ট চলে যাই''। ও মাথা নাড়তেই লক্ষীছড়ার ব্রীজ পেরিয়ে, পাইতুর বাজার হয়ে সোজা এয়ারপোর্ট। তখন আর প্লেন চলেনা। বন্ধ হয়ে গেছে। এয়ারপোর্টের পুরো রানওয়ে জুড়ে গরু ছাগল বেড়াচ্ছে। একটা বড় পাথরের মধ্যে আমি আর অনি বসে পড়লাম। ওকে প্লেনে আগরতলা যাবার গল্প শোনালাম। ছয় ঘন্টার সফর প্রায় দুঘন্টায় পুরো হয়েছিল সেবার। অত দূরত্বে আমি কিন্তু গাড়ী চড়তে পছন্দ করতাম না। খুব বমি হত। তাই আমাকে আর মাকে প্লেন এ আগরতলা পাঠাবার ব্যবস্থা হল। সেই প্লেন শিলচর, আইজল ঘুরে আগরতলা পৌঁছল। ততক্ষণে আমি নেতিয়ে পড়েছি। অনি এসব শুনত আর হাসত। ঝকঝকে রানওয়ের উপর সাইকেলে অনিকে বসিয়ে পাঁই পাঁই করে চালাচ্ছিলাম। চালাতে চালাতে কখন যে এয়ারপোর্টের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বুঝতেও পারিনি। পেছনে বসে অনিতো অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ খেয়াল করি শান বাধানো রানওয়ে ছেড়ে ঘাসের উপর চলে এসেছি। ওখান থেকে এয়ারপোর্টের অফিস টাও খুব ছোট দেখাচ্ছে। অনি তাড়া লাগাচ্ছিল। একটু বকুনিও দিচ্ছিল। এত দূরে চলে আসার জন্য। বললাম - 'চল ফিরে যাই'। ফিরতে গিয়ে দেখি, এক কোনায় একটি ছোট্ট মঠ। অনিকে জিজ্ঞেস করলাম মঠটার কাছে গিয়ে দেখে আসবে কিনা? ও একদমই রাজী হচ্ছিল না। রেগে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাকে ছেড়েও আসতে পারছিল না।

আমি এগিয়ে গেলাম মঠটার দিকে। পেছনে অনি। একটু এগুতেই বেশ বুঝতে পারলাম ঐ ছোট মন্দির টার মধ্যে কেউ একজন বসে আছেন। দেখলাম আমাকে ডাকছেন। অনি তখন বারবার বলছে - "চল ফিরে যাই। আমার ভয় লাগছে।" আমারও একটু গা ছমছম্ করছিল। চারদিকে তাকিয়ে দেখি বাড়ী-ঘর কিছুই নেই। থাকার মধ্যে শুধু এয়ারপোর্টের বাউন্ডারী ওয়ালটা একেবারে হাতের সামনে। সাইকেলটাকে দাঁড় করিয়ে, অনিকে এক হাতে চেপে ধরে আস্তে আস্তে এগুতে থাকি। অনেক লম্বা দাড়িওয়ালা একটা লোক আমাদের ডাকছে। কাছে গেলাম। দেখি লোকটা নেই। ম্যাজিক নাকি। একটু পিছিয়ে এসেছি, দেখি লোকটা আবার আমাকে ডাকছে। আবার একই কান্ড। সামনে যেতেই কেউ নেই। অনি আমার শার্ট ধরে টানছে। আমি বুঝতে পারছিলামনা কী করব। দেখি অনি নিজেই সাইকেলের দিকে যাচ্ছে আর বলছে — "আর যাসনা। চলে আয়। ওটা খারাপ লোক" আমিও এবার সাইকেলের দিকে ছুটলাম। পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি লোকটা এত জোরে জোরে ডাকছিল আর হাসছিলো যে আমি আর অনি সাইকেলে না উঠেই দৌড়ুতে শুরু করলাম। সাইকেলে ওঠার কথা ভুলেই গেলাম। সাইকেল হাতে টেনেই দৌঁড় লাগালাম। সাইকেলের প্যাডেল পায়ে লাগছিল। পড়েও গেলাম দুবার। অনি হাঁপাচ্ছিল। তখনো লোকটা হেসেই যাচ্ছে। আমি তখন একহাতে সাইকেল আর একহাতে অনিকে নিয়ে ছুটছি। একটা সময় অনেকটা দৌঁড়ে যাবার পর, পিছন ফিরে তাকাই। দেখি আর কাউকে দেখা যাচ্ছেনা। মঠটাও চোখের বাইরে। কোনমতে অনিকে ক্যারিয়ার এ তুলে সাইকেলে উঠে পড়লাম। অনি পেছন থেকে আমাকে জাপটে ধরেছিল, ভয়ে। তৃপ্তি টি স্টল এন্ড বেকারীর কাছে এসে সাইকেল থেকে নামলাম। দুজনে জল খেলাম আর দুটো করে কুকিস। বিনোদ সাহার দোকান থেকে চারটে তেঁতুল চকলেট।

সেদিন রাতে অনির খুব জ্বর এল। আমারও। কয়েকদিন লেগে গেল জ্বর সারতে। সুস্থ হয়ে গেলাম অনিদের বাড়ী। ও মা। অনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওর মা ওকে নিয়ে আগরতলা চলে গেছেন। ও আর ফিরে আসে নি। সুস্থ হয়ে আগরতলায় একটি স্কুলে ও ভর্ত্তি হয়ে যায়। অনেকদিন কোন খবর নেই আর। শুনতে পেরেছিলাম ও ডাক্তারী পড়ার চান্স পেয়ে বাইরে চলে গেছে। আমি ক্লাশ টুয়েলভ এর পর বাইরে চলে যাই। ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অনির সাথে। আমি প্রথম চিনতে পারিনি। আনমনা হাঁটছিলাম সার্কিট হাউস হয়ে শ্যামলী বাজারের দিকে। আমার নাম ধরে কেউ ডাকল। দাঁড়ালাম। কিন্তু যে ডাকছে তাকে তো চিনতে পারছিনা। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল- "কী রে, পুরো ভুলে গেলি? আমি অনি"। আমি সবিস্ময়ে তাকিয়ে। সেই অনি! ত্রিশ বছর আগের স্মৃতি ঝাঁপিয়ে এল। বললো ও ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। ওর ভাল লাগেনি। ও জীবনকে নিজের মতো করে বেছে নিয়েছে। এখন ভাল চাকরী করে। পুরোদস্তুর সংসারী। কিন্তু তার মধ্যেও অনির সজীবতা পুরোপুরি যেন সেই ছোটবেলার মতই। কতকথা বলে গেল ও। আমি শুধু ওর চশমাটা দেখছিলাম। দারুন ফ্রেমের চশমাটার ভেতরে ওর চোখগুলি চিক্‌চিক্ করছে। সেই ছোটবেলার সাইকেলের পেছনে চেপে ঘুরে বেড়ানো ছোট্ট অনির মতই।

সীমান্ত শৈশব

সুব্রত মজুমদার
বিলোনীয়া।

দুর্গা পুজো মানেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাওয়া শৈশবের অনুভূতি। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব বলে কথা। শৈশব স্মৃতিতে সীমান্তের এপার ও পারের মিলন আজও জ্বলজ্বল করছে। মনে পড়ে বিলোনিয়া শহর, শহর সন্নিকটে ও সোনামুড়ার গ্রামে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পুজো দেখার আনন্দে দিনগুলো যে কিভাবে চলে যেত, বুঝতেই পারতাম না। দশমীর দিন কাঁদা খেলা, মাকে সিঁদুর পরিয়ে বিদায় দিয়ে বিসর্জন দেওয়ার পর হৃদয়ের ক্রন্দন ও ভারাক্রান্ত মনে ঘরে ফেরার পর আগামীর জন্য অপেক্ষা করে মনকে সান্ত্বনা দিয়ে, লক্ষীপুজোর দিন কখন আসবে তার গণনা করতাম। বন্ধুদের সঙ্গে কি কি বাজি ফোটানো হবে বা কিনব, কোন্ বাড়ি থেকে নারকেল, কলারছড়ি, পেঁপে চুরি করতে হবে তার পরিকল্পনা ও আলোচনা করতে করতে লক্ষী পূজা পর্যন্ত দিনগুলো কাটত। বিলোনিয়া শহর লাগোয়া বি.কে.আই-র নিকট বাংলাদেশের বিলোনিয়া স্টেশনের রেল দেখার আনন্দ উপভোগ করার জন্য বন্ধুদের সাথে পূজার একদিন ছুটে যেতাম। নির্দিষ্ট সময়ে ছোট্ট একটি ট্রেন বিলোনিয়া স্টেশন আসত। চেকপোস্টের কাছে বাঁধের উপর থেকে আমরা কয়েকজন ট্রেন দেখার আনন্দ উপভোগ করতাম।

বিলোনিয়ার পুজোর মূল আকর্ষণ ছিল, কালীনগর, সাড়াসীমা সীমান্তবর্তী, কলেজস্কোয়ার, গিরিধারি টীলা, বেলটীলা, মহামায়া কালীবাড়ি, সাতমুড়া, বরজ কলোনি, বিদ্যাপীঠ, বনকর, ব্লাড মাউথ, মোটরস্ট্যাণ্ড, যোগমায়াকালীবাড়ি, ইয়ুথস্কোয়ার প্রভৃতি। পেণ্ডেলে পেণ্ডেলে চলত শেষ প্রস্তুতির উন্মাদনা। ছুটে যেতাম ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় কিছু পেণ্ডেলে যদি প্রথম মাকে দেখতে পারি তাহলে পরদিন বন্ধুদের শেয়ার করতাম, আমি এতগুলো ঠাকুর তোদের আগে দেখেছি। নতুন জামা, নতুন জুতা, শাড়ি এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি দেখানো হতো, সবাই এতে আনন্দে মেতে উঠতেন। পাড়ার সবাই শেয়ার করত সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত কি কি ড্রেস পরবে। বিলোনিয়ার সীমান্তবর্তী পূজাগুলো উপার বাংলার লোকেরাও উপভোগ করতেন। পুজোর দিনগুলোতে সীমান্তের এপারে অনুপ্রবেশ একটি সময়ের জন্য নির্দেশিত থাকতো! সপ্তমীতে যোগমায়া কালীবাড়িতে বাবা নিয়ে যেতেন। দশমীতে বনকর ঘাটে পুজোর প্রতিমাগুলোকে বিসর্জনের সময়ে হতো আরতি, কাঁদা খেলা সেকি আনন্দের অনুভূতি। দশমীর রাতে বা একাদশীতে কোন কোন পূজা পেণ্ডেলে ভিডিওতে সিনেমা দেখানোর চল ছিল। আমাদের পরিবারের সবার আকর্ষণ ছিল বাবার পৈতৃক বাড়ি সোনামুড়ার সীমান্তবর্তী গ্রাম হিম্মতপুর গিয়ে অষ্টমী থেকে দশমী পর্যন্ত পূজার আনন্দে মাতোয়ারা হওয়া। বিলোনিয়া কাশারী হয়ে নিদয়া গিয়ে, ওখান থেকে পায়ে হেঁটে বা জ্যেঠা মশায়ের কাঁধে করে রাজেন্দ্র টীলাতে কিছুটা বিশ্রাম করে হিম্মতপুরে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘন্টা লাগত। হিম্মতপুরের অনেকেই নিদয়া অপেক্ষা করতো আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তখনতো আর এখনকার মত এত গাড়িও ছিল না। আর রাস্তাও ছিলো কাঁচা। বিলোনিয়া থেকে নিদয়া পর্যন্ত খুব কম গাড়ি চলতো, বাবা আমাদেরকে রিজার্ভ জিপ গাড়িতেই নিয়ে যেতেন। হিম্মতপুরে পৌঁছার পর স্নান করেই অষ্টমীর অঞ্জলি নিতাম। পুরোহিত মশাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেন। তখনতো আর কাঁটা তারের বেড়া ছিল না, তাই ওপারের অনেক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক ও আমাদের পৈতৃক বাড়িতে পূজার আনন্দে সামিল হতেন। সন্ধ্যায় আরতি প্রতিযোগিতায় ছোট ও বড় দুই গ্রুপের অংশগ্রহণকারীরা অংশগ্রহণ করতেন।

আমার বাবা বিলোনিয়া থেকে আরতি প্রতিযোগিতার জন্য অষ্টমী ও নবমীর পুরস্কার কিনে নিতেন। আরতির রাতে জ্যেঠা মশায়ের কাছে আবদার করতাম দুর্গা মায়ের মর্তে আগমনের প্রেক্ষাপট ও মায়ের বিভিন্ন স্বরূপ শোনানোর জন্য। তিনি কৃষিকাজের

পাশাপাশি আধ্যাত্মিক বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞানী ছিলেন। আমরা সবাই গোল হয়ে বসে তাঁর কথা নীরবে শুনতাম। অনেক রাত পর্যন্ত চলতো সেই গল্প শোনানোর পালা।

পরদিন নবমীতে আমরা ছোটরা নতুন পোশাক পরে অঞ্জলি নিতাম। এরপর সবাই একসাথে প্রসাদ গ্রহণ করতাম। বিকেল বেলায় আশপাশের গ্রামের মানুষ আসতেন প্রসাদ নিতে। এক্ষেত্রে হিন্দু বা মুসলিম কোন বাছবিচার ছিলনা। রাতে হতো আরতি প্রতিযোগিতা ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ। দশমী পূজার পর বিসর্জনের প্রস্তুতি শুরু হতো। মন্ডপের সামনে মাটি কেটে জল ঢেলে কাঁদা খেলায় মেতে উঠতেন সবাই। দুপুরেই আমাদের বাড়ীর পাশের পুকুরেই বিসর্জিত হতেন দেবী। ভারাক্রান্ত মনে চলতো আগামী পুজোর আলোচনা এবং কুশল বিনিময়।

কোজাগরী লক্ষ্মীর সাতকাহন

— বর্ণালি দাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুম্বাই।

একটানা ঘর ঘর আওয়াজে অক্সিজেন কনসেনট্রেটর জানান দিচ্ছে মায়ের ঘরে। বিছানায় লেপ্টে থাকা অস্থিমজ্জা- সার মা আমার। বাড়ী ফেরত ঢু মারি একবার মায়ের ঘরে। ঢুকতেই ওষুধের তীব্র গন্ধ। নার্স পাশে বসে মোবাইলে মগ্ন। বাংলাদেশের সিলেটের জল্লার পারের দোকানের মনিপুরী সাদা শাড়ি লাল পাড় তুলে রেখেছিলাম মা ভালো হয়ে উঠে লক্ষ্মী পূজোর দিন পড়বে। সে আশা আজ ক্ষীণ। তাই নার্সকে বললাম মায়ের ম্যাক্সিটা পাল্টে শাড়িটা একটু মাকে জড়িয়ে দিক। আমার বাথরুমের আয়না থেকে একটা লাল টিপ জোগাড় করে এনে মাকে পরিয়ে দিলাম। একটানা শ্বাসপ্রশ্বাসের গোঙানির মধ্যেও মায়ের মুখটাএকটু যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আজ লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়তে পড়তে ছোটোবেলার আমাদের ঠাকুর দালানে বসে মায়ের গুন গুন সুর কানে বাজছে। "দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ। ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস। লক্ষ্মীদেবী বামে করি বসি নারায়ণ। করিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন"।

ছোটবেলায় দশমী পেরোতেই বাবার সঙ্গে বাজারে গিয়ে কোঁকরানো চুল লাল বেনারসী শাড়ি পরা লক্ষ্মী প্রতিমা কিনে আনতাম। টুকটুকে প্রতিমা ঠাকুর দালান আলো করে বসতেন।

চোখের সামনে ভাসছে আমাদের বাড়ির আমগাছটার ঠিক ওপরেই গোলগাল চাঁদ। তুলশি তলায় পিদিম জ্বলছে। পুজোর দিন একটা

লাল পাড় গরদের শাড়ি পড়ে মা আল্পনা আঁকছে চালের গুড়োর পিটুলি দিয়ে, কখনো বা লক্ষ্মীর পা আঁকা শেখাচ্ছেন ছোট্ট আমাকে। মায়ের আঁকা সুচারু লক্ষ্মীর পায়ের সাথে নাকের সিগনি মুছতে মুছতে ছোট্ট মেয়েটির আঁকা ধেবড়ে যাওয়া বিভিন্ন আকৃতির লক্ষ্মীর পা লাল মেঝেতে। শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনির সঙ্গে পাঁচালীর সুরের যাদু। মাঝে মাঝে আমাদের ছোটোদের অত্যুৎসাহী হুলু লু লু লু উলুধ্বনির তারস্বরে ঠাকুমার চোখরাঙানি আর মায়ের প্রশ্রয়ের হাসি। আহা, কত কী প্রসাদের বাহার। খিচুরি, লাব্রা, লুচি পায়েস আর সদ্য বানানো কড়া পাকের নারকেল নাড়ুর ম'ম' গন্ধ পুরো বাড়িতে।

গতকাল থেকে বাঙালী লক্ষ্মীর মূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি হন্যে হয়ে, ছোটোবেলায় একটা বিশাল বড় ফ্রেমের হাসিহাসি মুখের লক্ষ্মী প্রতিমা ছিল সিংহাসনে --- প্রতিদিন আমি ঠাকুরঘরে ঠাকুরমার বানানো নাড়ু চুরি করতে গেলে সেই লক্ষ্মী দেবী চোখ না রাঙিয়ে বেশ হেসে অভয় দিতো — সে মূর্তি মনে গেঁথে আছে আজও। কিন্তু এঁকে মহারাষ্ট্রে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বৃথা। শেষ পর্যন্ত মুম্বাইয়ের মারাঠী চারহাতের লক্ষ্মীমায়েরই শরণাপন্ন হলাম।

এদিকে আজ সকাল থেকে হাসপাতাল বাড়ির হাজারো কাজের মাঝে নমো নমো আল্পনা, ফুল মালা সাজিয়ে পাঁচালীর সুরে আবার ফিরে গেলাম ফুল পাতা ছাপ ছাপ ফ্রক পরা দুই বিনুনি বাদামী চুলের মায়ের গরদের শাড়ি, লাল টিপ, শাখাপলা চুড়ির টুংটাং আওয়াজের লক্ষ্মী পাঁচালীর কোজাগরী পূর্ণিমায়।

'দোল পূর্ণিমার নিশি নির্মল আকাশ।
ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস"।।

হঠাৎ খটকা লাগে, আজ যেন সেই

মুম্বাইয়ের মা লক্ষ্মী, ঘর ঘর গোঙানির বিছানায় লেপ্টে থাকা মা আর হাসপাতাল ফেরত ফুলপাতা ছাপছাপ শাড়ির লক্ষ্মী ব্রতকথাটা অনেকটা অন্য ধারার।

।। ১।।

ইকিড় মিকিড় চামচিকির পুতুলের সংসার -
দুই বিনুনির লাস্ট বেঞ্চে কাটাকুটি খেলা।
কাকভোরে গলাসাধা, বোঝাব্যাগ, স্কুলবাস - চশমার আড়ালে স্বপ্ন ভেঙে জ্যামিতিক জীবন।
আর আমার বয়ানে লেখা লক্ষ্মী ব্রতকথা।

।। ২।।

কলেজগামী বাসটা ধুঁকছে মোড়ের মাথায় - আটটার পি কে বি মিস, অ্যানাটমি ডিসেকসন হল।
প্রক্সির ডুব মারা, নোটস পাওয়া বিস্তর হ্যাঁপা, ছাপোষা জীবন মুঠোর দৈনন্দিন দমফুরোনো আমি।

।। ৩।।

একটা সোয়েটার বুনব বলে জট ছাড়াই জীবনের -
মেয়েলি ইচ্ছেদের তাড়া করে বেড়ানো সংসার।
জীবন, সংসার যেন উলের নক্সার লেনদেন।
সোজা উল্টো, চড়াই উৎরাই আর হাইফেন -
আর আমার বয়ানে লেখা লক্ষ্মী ব্রতকথা।।

।। ৪।।

হলদে বিকেলের পারিবারিক আড্ডা জমজমাট - আমার হাসপাতালের বেডের চারপাশে।
ভিজিটিং আওয়ার সম্বল আমার বেঁচে থাকা - স্বামী, কন্যা, পরিজন, বন্ধু সমাগম মুহূর্তে বাঁধা।
আর আমার বয়ানে লেখা লক্ষ্মী ব্রতকথা।।

।। ৫।।

মনিটরে অ্যালার্ম, ভেন্টিলেটরে একটানা ঘরঘর গোঙানি -
বড় মেজো ছোট ডাক্তারি ভিড়ে জানান দেয় জীবন।
বেডপেন, বেডসোর - আইসিয়ুর কটু গন্ধের তীব্রতা -
সচল মন নিয়ে আধাঅধুরা আমার নিশ্চল শরীর।
আর আমার বয়ানে লেখা লক্ষ্মী ব্রতকথা।

ভিন্ন আলো !

— মনীষা সাহা
উদয়পুর।

দৃশ্যপট-১

দুর্গা শহরের প্রতিষ্ঠিত এক বনেদি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। গত দশ বছর ধরেই ক্লাসের মেধা তালিকায় প্রথম স্থানটিতে দুর্গার একার রাজত্ব জারি রয়েছে। ছবি আঁকা এবং গানেও দুর্গা পারদর্শী। তবে এইসব কিছুকে ছাপিয়ে যে পরিচয়টির জন্য দুর্গা সবথেকে বেশি পরিচিত তা হচ্ছে জন্মলগ্ন থেকেই দুর্গা একজন ''ভিন্ন ভাবে সক্ষম'' মানুষ। কোথাও যাওয়ার জন্য বাবা কিংবা মায়ের কোলই দুর্গার পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল। বাবা সাধ করে দুর্গা নাম রাখলেও প্রতিবছর দুর্গাপূজার সময় নিজের নামটাই দুর্গার কাছে প্রহসন মনে হয়। কারণ নিজের ষোলো বছরের জীবনে এখনও পর্যন্ত দূর্গাষ্টমীতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতে পারেনি। আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগেই দুর্গা খুব ভালো করে উপলব্ধি করেছে যে এই জীবনে তার আর মায়ের চরণে অঞ্জলি প্রদান করার ইচ্ছে পূরণ হবে না। সেবার অষ্টমীর সকালে নতুন জামা পরে বাবার কোলে চেপে পাড়ার মণ্ডপে দুর্গা গিয়েছিল অঞ্জলিদানের জন্য। পাড়ায় আদরের মেয়ে বলে পরিচিত দুর্গার জন্য একটি বসার জায়গার ব্যবস্থাতো দূরে থাক কেউ সেদিন নিজের জায়গা থেকে একটুখানি সরে পর্যন্ত দাঁড়ায়নি। বাবার কাঁধে বসে মায়ের মুখখানি দর্শন করেই বাড়িতে ফিরে এসেছিল তারা বাবা মেয়ে। মেয়েটির অঞ্জলিদানের স্বপ্ন সত্যি হয়নি। মা বুঝিয়েছিলেন মেয়েকে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ঈশ্বর একজনই, মনে ভক্তি থাকলে বাড়িতে ঠাকুর ঘরে বসেও মা দুর্গার আরাধনা করা যায়। প্রতি বছর দুর্গা পূজার সময় ভোরবেলায় বাবার সাইকেলে চেপে দুর্গা সারা শহরের ঠাকুর পরিক্রমায় বের হয়। কিন্তু তিনবছর আগের সেই অষ্টমীর সকালের পর দুর্গা আর মা দুর্গার প্রতিমা দর্শন করেনি। বাবা জোর করলেও মেয়েকে প্রতিমার মুখ দেখাতে পারেননি। শুধুমাত্র মণ্ড পসজ্জা দেখতেই নাকি দুর্গার বেশি ভালো লাগে। এখন পুজোর দিনগুলোতে নিজের রং তুলির আঁচড়ে মা দুর্গার ছবি এঁকে সময় কাটাতেই বেশি ভালো লাগে তার।

দৃশ্যপট-২

ড. অর্জুন গঙ্গোপাধ্যায় মহাবিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। লুইস ব্রেইল তার আরাধ্য দেবতা। হ্যাঁ আপনারা ঠিকই ভাবছেন ড. গঙ্গোপাধ্যায় জন্মান্ধ। সেদিন মহালয়া উপলক্ষে কলেজে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনামিকা নামের যে মেয়েটি নিপুনভাবে অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করছে, সে এই বছরই বাংলা বিষয়ে সান্মানিক নিয়ে ভর্তি হয়েছে। মেয়েটি হঠাৎ তার প্রিয় স্যার হিসেবে ড. গঙ্গোপাধ্যায়কে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানায় দুর্গা পূজা নিয়ে কিছু কথা বলতে। আসলে আমাদের জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে যখন নিজের আবেগ সংবরণ করে কিছু বলাটা খুবই কষ্টকর। দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করেই ছোটবেলায় উনার নিজের চোখে না দেখতে পাওয়ার জন্য সবথেকে বেশি আক্ষেপ হতো। আর আজকে সেই দুর্গা পূজাকে নিয়েই কিছু বলতে হবে। উনি নিজের জীবনের দুর্গা পূজার স্মৃতির সাগরে ডুবে কথা বলতে শুরু করলেন। উনার মানসপটে একের পর এক চিত্র ভেসে উঠতে লাগল। একেবারে ছোটবেলায় মা-বাবা সহ

বাড়ির মানুষের উপস্থিতি গলার স্বর না শুনেও উনি অনুভব করতে পারতেন। ব্রেইল পদ্ধতিতে পড়াশোনা শুরু করার পরেও সেই স্পর্শের অনুভূতিই ছিলো একমাত্র মুশকিল আসান। কোথাও ঘুরতে গেলে মা নয়তো বাবার মুখের বর্ণনা শুনে নিজের মতো করে একটি দৃশ্য কল্পনা করে নিতেন। কিন্তু আসল গোল বাঁধলো দুর্গা পূজার সময়। চারদিকে মানুষের কোলাহল ঢাকের আওয়াজ শুনতে পেলেও দশ হাত যুক্ত মানবীকে তিনি কল্পনায় দেখতে পারলেন না। মা বুঝিয়েছিলেন দেবী দুর্গা জগৎজননী। সাবার মা তিনি। মা নিশ্চয়ই উনার কল্পনার রাজ্যে দেখা দেবেন। ছোট্ট অর্জুন মনের ভাবনায় মায়ের গায়ের মিষ্টি গন্ধতো অনুভব করতে পারেন কিন্তু মা দুর্গার গায়ের সুভাস? শেষমেশ স্কুলের এক স্যার মাটি দিয়ে ছোট্ট অর্জুনের জন্য মা দুর্গার প্রতিমা তৈরি করেন। যা আকারে খুবই ছোট ছিল। এই প্রতিমাই ছিল ড. গঙ্গোপাধ্যায়ের দুর্গাপুজোর প্রথম অনুভব। তারপর আস্তে আস্তে বড়ো হওয়ার পর দুর্গাপুজো মানেই বছরের এই একটি সময় বন্ধুদের সঙ্গে একদিন সময় কাটানো। আর এখন কিছু পুজো বার্ষিকীর কিছু অডিও বুক শুনতে শুনতে মানসপটে দুর্গার অবয়ব এঁকে নেওয়া।

উপরে যে দুটি দৃশ্যের বর্ণনা করলাম এই দৃশ্য দুটি আসলে "ভিন্ন ভাবে সক্ষম" মানুষদের দুর্গাপুজো উদ্‌যাপনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। উৎসব মানেই আমরা বুঝি এক আনন্দ অনুভূতি, মানুষের মিলনমেলা। আবার ভাবি উৎসব সত্যিই কী প্রতিটি মানুষের জীবনে আনন্দ বার্তা নিয়ে আসে? যারা তথাকথিত সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বলে নিজেকে দাবি করেন কখনো কি ভেবে দেখেছেন দুর্গা বা অর্জুনের মতো চারপাশে যারা আছেন তাদের দুর্গা পূজা কেমন করে কাটছে? এই মিলনমেলায় তারা নিজেদের সামিল করতে পারছেন কিনা?

জন্মসূত্রে বা দুর্ঘটনাজনিত নানা কারণে মানুষ প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। তাদের জীবনে চলারপথে বাধার অভাব নেই। নিজেদের এই প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে তারাও চান উৎসবের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠতে। কিন্তু রুক্ষ বাস্তবে বাধার সম্মুখীন হন। তখন তারা অর্জুন বা দুর্গার মতো নিজস্ব ভাবনায় উৎসব উদ্‌যাপন করতে চেষ্টা করেন। ঠিক যেভাবে পিঁপড়ের দল একটি রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে আর একটি রাস্তা দিয়ে নিজেদের পথ তৈরি করে নেয়। সারাদিন পাড়ার মণ্ডপ থেকে ভেসে আসা গান শুনতে শুনতে তাদেরও ইচ্ছে হয় একটিবার টুক করে মণ্ডপ থেকে একটু ঘুরে আসার। তাদেরও ইচ্ছে করে অষ্টমী বা নবমীদুপুরে পড়শিদের সঙ্গে পাতপেড়ে অন্নভোগ খেতে। আর পাঁচটা স্বাভাবিক মানুষের মতো সারা রাত জেগে ঠাকুর পরিক্রমায় বের হতে তাদেরও ইচ্ছে হয়। কিন্তু ইচ্ছেগুলো পূরণ করার কোনো সুযোগ থাকে না। আর তখনই মনের ইচ্ছেগুলোকে বাক্সবন্দি করে তারা নিজের মতো কিছু উপায় বের করে নিয়ে পূজার দিনগুলো কাটিয়ে দেয়। যেমন কেউ সারাদিন সিনেমা দেখেই কাটিয়ে দেয়। আবার কেউ হয়তোবা বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে রাখে। আর অনেক সময় বন্ধুভাগ্য ভালো হলে একটি দিন অর্জুনের মতো বন্ধুদের সঙ্গে হৈ হুল্লোর করে বেশ কেটে যায়। সবথেকে বেশি অসহায় বোধ করেন ভিন্ন ভাবে সক্ষমদের বাবা মায়েরা। উনারা ইচ্ছে করলেও নিজেদের সন্তানদের নিয়ে রাতের আলোকজ্জ্বল শহর পরিক্রমায় বের হতে পারেন না। কারণ ভীড় থিকথিকে রাজপথে স্ট্রেচার বা হুইলচেয়ার এক বড় বিড়ম্বনা। তথাকথিত সুস্থ মানুষেরা নিজেদের নিয়ে এতটাই মত্ত যে কেউ একচুলও জায়গা ছেড়ে দেবেন না! আর যদিওবা কোনোভাবে মণ্ডপে পৌঁছানো গেলো তা হুইলচেয়ার ব্যবহার সহায়ক থাকে না। সেই তো দূর থেকেই মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে হয়। অনেকেই হয়তো ভাবছেন টিভির নানা চ্যানেলে নিয়মিত দুর্গাপুজোর সম্প্রচার হয়ে থাকে। তাহলে বাড়িতে বসেইতো পুজো দেখা যায়। একবারও আপনারা বুঝতেই পারবেন না যে ক্যামেরার লেন্সে দেখা আর নিজের চোখের লেন্সে দেখার মধ্যে কত পার্থক্য রয়েছে। আর সবথেকে বড়ো হচ্ছে অনুভূতি ..... । মায়ের প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে তাঁকে প্রণাম করা আর টিভিতে মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করা দুটি অনুভূতি কখনো এক হাতে পারে কি? আমরা আন্তরিকভাবে চাইলে কী এই আনন্দযজ্ঞে চারপাশের অর্জুন এবং দুর্গাদের সামিল করতে পারিনা? বোধহয় পারি! আমার বিশ্বাস উদ্যোক্তারা ঐকান্তিকভাবে পাশে থাকলেই দুর্গা,অর্জুনদের উৎসব ভিন্ন আলোয় আলোকিত হবে।

মনে পড়ে সেই মুখখানি ...

অমিতাভ দাশ
উদয়পুর।

ত্রিপুরা সুন্দরীর পীঠভূমিতে শক্তিপুজো মানা? এই অটল বিশ্বাস আর অমাঙ্গলিক ভয়ে আচ্ছন্ন ছিল প্রাচীন রাঙামাটি। দশভূজার পুজো করার কথা ভেবেও বার বার পিছিয়ে যাচ্ছিলেন উদ্যোক্তারা। আজন্ম লালিত বিশ্বাস আর সংস্কারের কাছে পরাভূত হচ্ছিল যুক্তি-তর্ক। জনশ্রুতি এর মধ্যে একটি বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন খিলপাড়া গ্রামের বাসিন্দা নবীন দপ্তরী। তাঁর বাড়িতেই নাকি প্রথম হয়েছিল পরিবার কেন্দ্রিক দুর্গাপুজো। এর পরপরই শুরু হল বিপত্তি। মানে ওই পরিবারে চললো মৃত্যুর মিছিল! চলতি কথায় নির্বংশ হয়ে গেলেন নবীন দপ্তরী? যদিও তিনি বা তাঁর পরিবারে কারা কারা ছিলেন, ওদের বাসস্থানটি গ্রামের ঠিক কোনদিকে ছিল সে সম্পর্কে আজ আর কিছুই জানা যায় না। তবে সেই মৃত্যু মিছিল গোঁড়াদের প্রভূত রসদ জোগালো। ওরা একজোট হয়ে তাঁদের পুরোনো মতকেই আকড়ে ধরে থাকলেন। যদিও অল্পদিনের মধ্যেই অন্ধসংস্কারের বিরুদ্ধে গড়ে উঠলো জনমত।

প্রসঙ্গত প্রথম রত্নমাণিক্যের মুদ্রায় 'শ্রীদুর্গাপদ' বা 'শ্রীদুর্গাআরাধনা প্রাপ্ত' ইত্যাদি লেখা পাওয়া গেছে। রাজমালায় আছে মহারাজ ধণ্যমাণিক্যের সেনাপতি রায় কচাগ থানাংচি দখল করার পর অধিকৃত দুর্গেই পুজোর আয়োজন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাজমালায় লেখা আছে—

"দুর্গোৎসব হয় তথা নৃপ নাম করি।
তদবধি থানার নাম ত্রিপুরার পুরী।।"

মহারাজ অমরমাণিক্যের রাজত্বেও রাজধানী উদয়পুরে দুর্গাপুজো হয়েছে। কল্যানমাণিক্যের সময় হয়েছে দুর্গাগৃহ নির্মাণ। আসাম থেকে আসা দুজন দূত রত্নকন্দলী শর্মা, অর্জুন দাস বৈরাগীর বর্ণনায় দুর্গামূর্তির কথা ইত্যাদি তথ্য নানা গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। শোনা যায় গোঁড়াদের অনড় যুক্তির উত্তরে ওইসব তথ্য, সেইসঙ্গে আগরতলা দুর্গাবাড়ী, অসামের কামাখ্যাপীঠের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে পুজোর পক্ষে সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জগন্নাথ (পুরাণ) দীঘির পূর্ব ও পশ্চিম পাড় এবং বাজার অঞ্চলের আধুনিক মনস্ক বিশিষ্টজনেরা। সেই থেকে ত্রিপুরার প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপুজোর আয়োজন করল প্রাচীন রাজধানী। সময়টা সম্ভবত ১৯৩৯-৪০সাল। পোষাকি নাম 'উদয়পুর টাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসব'। পুজোর স্থান ছিল বর্তমান টাউন হল (জামতলা) চত্বর। লোকমুখে তা টাউন হলের পুজো নামেও পরিচিত ছিল। তথ্য বলছে প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছিলেন যথাক্রমে বসন্ত কুমার সেন ও সুধীর চন্দ্র ঘোষ। এ অব্দি ঠিক ছিল। কিন্তু প্রথম সর্বজনীন আগমনীর পরপরই ফের ঘটে বিপত্তি। আয়োজকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন না ফেরার দেশের যাত্রী হলেন। ব্যস্ গোঁড়াদের আর পায় কে? ওঁদের শক্তি যেন আরোও বেড়ে গেলো। তাতে অবশ্য দমবার পাত্র ছিলেন না সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সদস্যরা। প্রথম সভাপতি ও সম্পাদককে সামনে রেখেই শুরু হলো দ্বিতীয় আয়োজনের প্রস্তুতি। এবং সেবছর ওঁরা সাফল্যের সঙ্গেই পুজোর কাজ সমাপন করলেন। উত্তরসূরীদের প্রচেষ্টায় সেই সফলতার ইতিহাস দীর্ঘায়িত হলো। টাউন হলের পর পূর্ববাজার, ধর্মাশ্রম, জামজুরি, বেড়েছিল পুজোর সংখ্যাও।

এদিকে নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে শুরু হল প্রথম পুজোর প্রস্তুতি। কিন্তু উদয়পুরে তখন প্রতিমা গড়ার কোন লোক ছিল না। কুছ পরোয়া নেই, সম্পাদক মশাই ঢাকার বিক্রমপুর থেকে কারিগর নিয়ে এলেন রাঙামাটিতে। মৃৎশিল্পী বাবা বিহারী লাল পালের হাত ধরে বিষ্ণুপদ, নারায়ণ ও সুনীল সহ গোটাপরিবার পাড়ি দিলেন জলাশয়ের এই শহরে। সেই থেকেই ওরা মন্দিরনগরীর স্থায়ী বাসিন্দা।

বিহারীলাল তাঁর শিল্পশালা খুলেছিলেন অশোক পেট্রোলিয়ামের উল্টোদিকে চন্দ্রাবলী মিশ্রের জায়গায়। সম্ভবত সুধীর ঘোষই ওখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হয়তো এক বুক স্বপ্ন ছিল, এখানেও গড়ে উঠবে পাল পরিবারের মৃৎসাম্রাজ্য! অপরূপ মূর্তি গড়ে বিহারীলাল সকলকে মুগ্ধ করে দিলেন। তবে তাঁর শৈল্পিক হাত কতদিন সচল ছিল তা জানা নেই। কিন্তু বিষ্ণু পালের দুর্গামুখশ্রী এখনও মিথ হয়ে ঘোরে প্রবীণদের মুখে মুখে। বেঁটেখাটো চেহারার ওই মানুষটির স্কুল জীবন ছিল পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্তই । যদিও পুঁথিগত

বিদ্যা নয়, তাঁর শিল্প সুষমাই মন কেড়েছিল সবার। শক্তিপীঠের মাহাত্ম্যকে উপেক্ষা করে প্রাচীন রাজধানীতে দুর্গাপুজোর আয়োজনতো এক রূপকথার কাহিনী। ধর্মপ্রাণ মানুষের সুখে-দুঃখে আবর্তিতা ত্রিপুরাসুন্দরী! চোখ বুজলেই ষোড়শী মায়ের মুখ। কালো পাথরের মূর্তি যেন সদা জাগ্রত! উৎসব আয়োজন নিয়ে দ্বিখণ্ডিত মানুষদের সব সংস্কার দূরে ঠেলে এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছিল সেই দুর্গপুজো। শতবর্ষ ছুঁই ছুঁই টাউন হলে প্রায় আট দশক (মতান্তরে নয় দশক) আগের এই পুজোয় আপ্রাণভাবে সামিল হয়েছিল গোটা জনপদ। সেদিন যেন সত্যিকার অর্থেই জুড়ে গিয়েছিলো পাহাড় থেকে সমতল। ঢাকের বাদ্যি, হ্যাজাক আলো আর ধুনুচি নাচে মাতোয়ারা ছেলে বুড়ো সবাই। এ তো ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন। কৈলাশ থেকে তিনি যেন দুর্গারূপে রাঙামাটিতে। 'ভগীরথ' বিষ্ণুপদ দুর্গা মুখশ্রীতে কী যাদু ছুঁইয়ে দিলেন। টানা টানা দীঘল চোখের মায়ায় কেটে যায় অগনন সময়। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি একদল যুবকের (নরেশ চন্দ্র মোদক, চিত্তরঞ্জন ঘোষ (কানু), দেবপ্রসাদ দাশ (যাদু), দিলীপ সেন, মৃণাল কান্তি রায় (ঝুনু), প্রবাল বিন্দু কর, রঘুদয়াল ভট্টাচার্য প্রমুখ) সংযুক্তি এবং ওঁদের হাত ধরেই সাবেকীয়ানার সঙ্গে যুক্ত হলো অল্পবিস্তর আধুনিকতাও। এক কাঠাম ভেঙ্গে দুর্গাপরিবার আলাদা হলেন ওঁদের ব্যবস্থাপনায়? বিষ্ণু পালের মূর্তির সঙ্গে মন্ডপ ভাবনায় যুক্ত হন সমরেন্দ্র দাশগুপ্ত (পিন্টু)। বাড়তি পাওনা নতুন ধরনের বৈদ্যুতিক আলো, মাইক ইত্যাদি। তবুও যেন সবকিছুকে ছাপিয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকতো বিহারীলালের বড় ছেলের তৈরি দুর্গামুখশ্রী। আর এর সুবাদেই তিনিও হয়ে উঠেছিলেন রাঙামাটির মৃৎশিল্পের অবিসংবাদী মুখ। প্রবীণদের কথায় তাঁর হাতের ছোঁয়ায় মৃন্ময়ী বাস্তবিকই হয়ে উঠতো চিন্ময়ী!

সময়ে এগিয়েছে। এগিয়েছে প্রজন্ম। বদলছে সময়ের চাহিদা। প্রয়াত হয়েছেন বিষ্ণু পাল। সেও প্রায় দশক কেটে গেছে। শুধুমাত্র তাঁর মেজো ছেলে তপন পালই ধরে রেখেছেন পারিবারিক পেশা। তাকে সঙ্গত করেন স্ত্রী মঞ্জুরাণী দেবনাথ। অন্য দুইভাই এবং কাকা কেউই যুক্ত নন পারিবারিক পেশায়। খুড়তুতো ভাই তাপস বিশেষ পার্বণে মূর্তি গড়েন। এককথায় তিনি প্রায় একা কুম্ভ! এ কী শেকড় ছিঁড়ে বেড়িয়ে যাওয়া, নাকি অন্য তাড়না? তপনের জবাব স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে যূথবদ্ধ উদ্যোগের অভাব, আর তীব্র আর্থিক টানাপোড়েনই আমাদের মৃৎশিল্প থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, দিচ্ছে। একসময় যে মুখশ্রীর সুষমায় আমোদিত হয়েছে গোমতী অববাহিকা, সেই মুখ আজ অবলুপ্ত। কারণ বাপ ঠাকুর্দার সময়ের ছাঁচের মূর্তি এখন অচল। তাই ভিন্ন মুখ বসিয়েই দুর্গাপরিবার গড়েন তপন। অকপট জানালেন সে কথা। সঙ্গে তথ্য দিলেন শহরের বিগ বাজেটের মন্ডপে আমাদের মূর্তি নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে বহুদিন। শহরতলী বা গ্রামই এখন প্রধান ভরসা। সময়ের অভিঘাতে ঢাকা বিক্রমপুর থেকে বয়ে আনা রাঙ্গামাটির সেই উজ্জ্বল মুখ এখন খুব সযতনেই শোভা পাচ্ছে তপন পালের খরে মোরা বাক্সে। .... তবুও বোধনসন্ধ্যা ঘনালেই আবছা আলোয় মনে পড়ে সেই মুখখানি!

টাউন সর্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রতিমা। ছবি: প্রয়াত দেবপ্রসাদ দাশের সংগ্রহ থেকে।

গ্যাঁড়াকল

— সুখ চন্দ্র মুড়াসিং
বিলোনীয়া।

রাত প্রায় আটটা, চারতলার ছাদে আসন পেতে পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়ার বাজানো মিঞা কি মালহার রাগে বাঁশী শুনছি রঙিন পাত্র নিয়ে। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার একান্ত নিজস্ব ঘরোয়া পদ্ধতি। মুঠোফোন স্ক্রিনে ভেসে উঠল সহকর্মী বর্তমানে শিলিগুড়ি অফিসে কর্মরত আতানুবাবুর নাম। সাড়া দিতেই কুশল বিনিময় করে বলল- আগামী মাসের দশ তারিখ তিনদিনের জন্য আগরতলায় আসছি। থাকব তোমার ওখানে। সঙ্গ দিতে হবে কোন বাহনা চলবে না। না বলার কোন অবকাশ সে রাখেনি। সব শুনে গিন্নি তেলে বেগুনে জ্বলে গজ গজ শুরু করল। এ মহিলা গজরাবে কিন্তু বর্ষাবে না। সময়মত ঠিকই সব সামলাবে। বিমানের সফর সূচি দেখে মাথায় হাত, পাঁচদিনের অফিস কামাই হচ্ছে। মঙ্গল মত দুইদিন রাজধানীর নানা স্থানে ঘুরিয়ে দেখালাম বিপত্তি শেষ দিনের শেষ বেলায়। পুরানো সেক্রেটারিয়েট অফিসের সামনে উড়াল পুল থেকে নেমে ভি আই পি রাস্তার বাঁদিকে মোড় নিতে গিয়ে খট খট শব্দ করে গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়ল। পেছনে নানা গাড়ির সারি লম্বা হতে লাগল গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত খাই খাই সাইরেন বাজিয়ে একসঙ্গে দুইটি অ্যাম্বুলেন্স এসে হাজির। পেছনে থেকে গালি গালাজ খিস্তি খেউর উড়ে আসতে লাগল। এক অটো চালক বেশ জোড়ে গাড়ির পেছনে ধাক্কা মেরে বসল। রাস্তার দুই পাশ থেকে দুইজন ট্রফিক পুলিশ দৌড়ে এসে হম্বিতম্বি শুরু করেদিলেন। ভি আই পি জোনে কর্তব্যরত আরক্ষা কর্মী গাড়ী থেকে টেনে নামিয়ে পাছায় দুই ঘা কষিয়ে দিলেন। সমস্যা কি কেউই জানতে চাইছেননা। হট্টগোল বেড়েই চলছে। কোথা থেকে যেন এক দেবদূত এসে হাজির। বললেন গাড়িতে বসে ক্লাচচাপ দিন। ট্রাফিক কর্মীদের বললেন গাড়িটাকে পেছন দিকে ধাক্কা মারুন।

রাস্তা কিছুটা ফাঁকা হওয়ার পর ময়না তদন্ত শুরু হল, ড্রাইভিং দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ নথি পত্র যাচাই নেশাগ্রস্থ কিনা পরীক্ষা মূল সমস্যা কি কেউ জানতে চাইছেন না। দেবদূত আবারও সহায় হলেন বললেন - বাঁ দিকের ডাইসেভ ভেঙে গেছে গাড়ী আর এগোবেনা, পিছবেওনা। এটা যান্ত্রিক সমস্যা ইচ্ছাকৃত নয়। আইনের গ্যাঁড়াকল থেকে রেহায় পেলাম কিন্তু পশ্চাতদেশের ব্যাথা থেকে কবে রেহাই পাবো জানিনা?

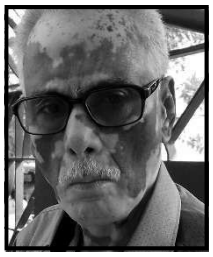

ধরে নিয়ে যাবে কোটালে

— মিহির দেব
আগরতলা।

ক্রমশঃ প্রকট হচ্ছে দাঁত, নখ
রক্ত চক্ষু ভয় —
যেমনটা হয়েছিল
অজাতশত্রু কিংবা ঔরঙ্গজেবের সময়।

মসনদ অটুট রাখতে
প্রতিদিন ফরমান —
কী করা যাবে এবং কী নয়,
কী বলা যাবে এবং কী নয়,
কী লেখা যাবে এবং কী নয়।

যে পথ দেগে দেওয়া হবে
হাঁটা যাবে শুধু
সেই পথ বরাবরই।
একটু এদিক ওদিক হলেই
ধরে নিয়ে যাবে কোটালে।

আদি-অন্ত-হীন ইতিহাসের কাল রেখা থেকে
সময় পর্যন্ত গুটিয়ে যায়
যার সামান্য অঙ্গুলি হেলনে
সেই মহারাজ বিধির বিধানে।

তাই বলি —
সাবধান হয়ে যা;
খেতে পরতে পারছিস;
এইতো যথেষ্ট!
বুঝেছিস?

তিনটি কবিতা

— দিলীপ দাস
আগরতলা।

এক
নদীপারের বটগাছটি
তার শিকড়কে ভোলেনি।
তাই মাঝরাতে ফিরে আসে ধূপকাঠি নিয়ে।

দুই
আমি যাচ্ছি।
তুমি ভাল থেকো।
বসন্ত বলে গেল গ্রীষ্মকে।

তিন
হেমন্ত বারান্দায় বসে আছে।
কুয়াশা এখনো ঘরে ফিরেনি।
অথচ সন্ধ্যা হয়ে গেল।

ভুলাই নাই যাইস

— বিপ্লব উরাং
আগরতলা।

বেচারাম, ...
ভুলাই নাই যাইস -
তুই শনিয়া মুন্ডার বেটা।
ঘাম ঝরায় মার ভাত আর লাল চা পানি
খাওয়াই করে তকে দারগা বনাইছে।

শুনেছি তুই দারগা হয়েছিস।
ভাল কথা।
তুই চা শরমিকের বেটা।
কত কষ্ট করে লিখাই পড়হা করাইছে।
জানিস কি তুই?

যে মজুরি পাইত পেটের
ভাতই যোগাড় নাই হইত।
মজুরি বাড়ানের লড়হাই করল
ধরে লিয়ে গেল পুলিশ।
মিছা মামলাশ জেল খাটল।
সময় পাল্টালে বাগানে স্কুল হইল।
লিখাই পড়াহা শিখাইল ...
দারগা বনলি।

দেখ বেচারাম, মনে রাখিস
শরমিকরা মজুরি বাড়ানের লড়হাই করলে মিছা
মামলায়
নাই ফাঁসাবি।
তুপ যে শরমিকের বেটা।
ভুলাই নাই যাইস।

রামরতিয়ার বিটির ইজ্জত লুটল মেনজার
মটা দাগের টাকারলোভ দেখাবেক -
কেইসলে খালাস হওয়ার লাগি।
তুই কি করবি দারগা বাবু?
ভাল করে ভাবে দেখিস

চলে যাওয়ার পর

— অপন দাস
উদয়পুর।

কবি চলে যাওয়ার পর
কবিতা গুলি গাছের পাতা হয়ে যায়
একটু বাতাসেই তিরতির করে কাঁপতে থাকে
উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই
কিছু পাখি এসে বসে গাছে
কিছু উড়ে যায়
কিছু খুঁটে খুঁটে খায় কাচা পাকা ফল
পথ দিয়ে পথিকেরা যেতে যেতে
গাছের দিকে চায়, পাতার দিকে চায়
কেউ কেনো দিকে না চেয়ে চলে যায়

মানুষের চলে যাওয়ার পর
পাতাগুলি আরো একা হয়ে যায়।

স্বপ্ন, রংধনু

— স্বপন মজুমদার
উদয়পুর।

ভোরের জড়তা কাটিয়ে চোখ খুলে যেই দেখি তোমাকে,
চায়ের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে আছো মায়াবি চোখে।
বড়ো ভালো লাগে —
বড়ো ভালো লাগে,
মনে হয় দেখছি শিশিরে ভেজা গোলাপটি ফুটে আছে
আমার প্রিয় বিছানার পাশে,
দেখছি, শুধু দেখছি, আবাক চোখে।

সদ্য ভেজা খোলা চুলে
প্রভাতের সূর্য্যটা কপালে এঁকে
লাল পেড়ে এক কাছা শাড়িতে
অঙ্গ ঢেকে সোহাগের হাতটি এগিয়ে দিয়ে
আমার দিকে, মুখ ফুটে বললে,
নাও চা নাও
যেন কানে বাজলো সেতারের ধ্বনি পলকে।
বড়ো ভালো লাগে,
বড়ো ভালো লাগে।
দেখছি, শুধু দেখছি, অবাক চোখে।

বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না,
তোমার কমল কোমল মুখখানা
যেই আসে চোখের সীমানায়,
নিমেষে সব অলসতা
মনের সব জড়তা
কোথায় যেন পালায়।
জাগে উদ্যম প্রাণে তোমার আগমনে,
বুঝবেনা কত ভালোবাসা
তোমারই জন্য জমা আছে বুকে।
বড়ো ভালো লাগে,
বড়ো ভালো লাগে,
দেখছি, শুধু দেখছি, অবাক চোখে।

চায়ের পেয়ালা রেখে বিছানায়, যাচ্ছিলে হেসে চলে,
মনের অজান্তে হাতটি আমার
তোমার নরম তুল তুলে হাত ধরে ফেলে।
যেই কাছে নিলাম টেনে, যেন এক প্রলেপ আধার
মাখা ঘরে আলো এলো নেমে,
লজ্জায় আবির নত মুখে বললে — ছাড়ো,
দোহাই ছাড়ো, কেউ যদি হঠাৎ দেখে ফেলে।
কি যে হবে দিনের আলোকে।
বড়ো ভালো লাগে,
বড়ো ভালো লাগে,
দেখছি, শুধু দেখছি, অবাক চোখে।

একটু দুষ্টুমি, একটু খুনসুটি
যদিও তোমার মনের বিপরীতে,
তবু একাকার তোমাতে আমাতে।
তুমি রাগছিলে, সাপিনীর মত, ফুসছিলে,
আরো ভালো লাগছিলো,
আরো, আরো সুন্দর দেখাচ্ছিলো,
যেন চায়ে দ্বিগুন মিষ্টিতে জেরবার,
সুযোগ বুঝে উঠে গেলে ছুটে,
দরজায় দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে
বললে — দুষ্টু কোথাকার।
বলার সময় যে ঝিলিক দেখেছি তোমার চোখে,
যা এখনও গেঁথে আছে মনে,
অফিসে ফাইলের পাতায় পাতায়।
স্বপ্ন—রংধনু যায় এঁকে।
বড় ভালো লাগে,
বড় ভালো লাগে,
দেখছি, শুধু দেখছি, অবাক চোখে।

আমার আগময়ী

— ডঃ দেবযানী ভট্টাচার্য
আগরতলা।

ছোট্ট মেয়েটি পুতুল হাতে ছুটে এল
গলা জড়িয়ে জানতে চাইল, বলো তো আমি কে?
প্রত্যুষের প্রথম আভায় ঘুমের ঘন গহন থেকে
আবছা ঘোরে জড়িয়ে সুধা বলল, তুমি ....
তুমি আমার সেই অনুভূতি মা, যা অব্যক্ত
তুমি আমার সেই শরীর, যা আমার মনভরে সৃষ্টি
এমন কোনো সূর্য নেই
যার তীব্র আলো তোমায় আলো দেবে,
এমন কোনো চাঁদ, তারা নেই
যারা তোমার কপালে টিপ পরাবে, কানে ঝুমকো
এমন কোনো জ্যোৎস্না নেই
যা তোমায় মখমলে সাজিয়ে দেবে,
এমন কোনো আকাশ নেই
যা তোমায় মুক্তি দেবে,
এমন কোনো হাসি নেই, যা মুক্তো ঝরাবে
এমন কোনো কান্না নেই, যা বৃষ্টি ঝরাবে
এমন কোনো ক্লান্তি নেই, যা তোমায় বসিয়ে দেবে
এমন কোনো পলক নেই, যা তোমায় হারিয়ে ফেলবে
এমন কোনো বসন্ত নেই, যা তোমায় রাঙিয়ে দেবে
এমন কোনো হৃদয় নেই, যা তোমায় ঘর দেবে
এমন কোনো মন নেই, যা তোমায় মানিয়ে নেবে
এমন কোনো ভালবাসা নেই
যা তোমায় অনন্ত ভালবাসবে
এমন কোনো রাত নেই, যা তোমায় লুকিয়ে রাখবে
এমন কোনো দিন নেই, যা তোমায় ভরিয়ে দেবে
এমন কোনো জন্ম নেই, যা তোমায় সৃষ্টি করবে
এমন কোনো মৃত্যু নেই, যা তোমায় শেষ করবে
এই গ্রহ, আলোকবর্ষ, মহাকাশ জুড়ে
অনাদি-অনন্ত-চির শাশ্বত মাগো
তুমি আমার চির আগমনী।
বহুযোজন দূর থেকে ভেসে এল কার কণ্ঠস্বর .....
বাহ্ কি ফুট ফুটে মেয়ে হয়েছে সুধার।

যে মাটি ভিজেছে রক্তে

— **গোপা দত্ত**
উদয়পুর।

এক
যে মাটি ভিজেছে
রক্তে, সে জানে
তোমার আর্তচিৎকার।

যে বন দেখেছে -
সে ছিল না নির্বিকার,
কেঁদেছিল তোমার লাগি,
সবার অলক্ষ্যে ফুল
দিয়ে করে ছিল
তোমার সৎকার।

দুই
সীদলে বাঁশের
গন্ধ পাওয়া যায় না,
বাঁশেরা নদীতে বেড়ায়,
পুকুরে পদ্ম ফোটে না, এখন
পোনা মাছের কাতরতা,
মাছেরা দেশী খাদ্য
ভুলে গেছে,
ওরা গাড়িতে চড়ে
মানুষের মত।

পথ

— **লক্ষ্মণ কুমার ঘটক**
আগরতলা।

আজও পেরিয়ে এসেছি সেই পথ,

বিশ্বের এমন কোনো পথ নেই,
যে পথে কেউ হাঁটে নি।

সব পথ সড়কে পৌঁছোয় বলে,
সে দিকে হাঁটে সবাই,

পথের প্রান্তে যাঁরা,
তাঁরাও সড়কের দিকেই হাঁটে,

অবসন্নতায় যাঁরা পৌঁছুতে পারে না,
তাঁরা পথে থাকে বলে,

কেউ কেউ চোরা পথ খুঁজে নিয়েছে।

আপনি কোন পথে হাঁটছেন,
সেটা জানার জন্য,

নিজেকে জিজ্ঞাসা করা সবচেয়ে সহজ।

স্মৃতিকথা

— **আশিষ চট্টোপাধ্যায়**
উদয়পুর।

আজন্ম এক নদীর
স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে বর্তে আছি।
বুকে সাঁতার কাটে সে
মরমী মানুষের মুখ ভাসে জলে,
ধরতে গেলে স্মৃতি হয়ে যায়
অমলিন হাজারো স্মৃতি
জলঘূর্ণিতে ঘূরপাক খায়।

গোমতীর জলে ভাসে
স্বপ্ন স্মৃতি মানুষ
বুকে আদিম অরন্য শোভা পায়।

আজ যানে কি জিদ না করো

— রাহুল সিনহা
আগরতলা।

কালো কফি শেষ হয়ে এলো কাপে বসে বসে,
এখনও জবাব এলো না তোমার।
আপাতত তোমার চুলের মতো কালো আকাশ
ভেঙে বৃষ্টির ফোঁটারা ভিজিয়ে দিচ্ছে পথঘাট,
আমি জানালার কাছে বসে আছি,
বয়ে যাচ্ছে সুসময়।
কবে তিনগাঁয়ের ঘাটে লাগলো সাদা বেনের পোত,
পিরিলির বামুন আর দেখাদেখি আরও জমিদারবাবুরা
নুনের দেওয়ানি শিখে গেলো।
আমি এখনও ঠায় বসে,
তুমি কেন চলে যেতে চাইছো কে জানে?
মেটেবুরুজের দেওয়ালে কান পাতলে
এখনও শোনা যাচ্ছে
'সব ছোড় চলে লখনউ নগরী ....
ফরিদা খানুম এখনও শেষ করেননি গজল,
বাতাসে মিলেমিশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আতর সুবাস আর নোনা ঘামের গন্ধ।
দরদাম করতে ভালো লাগে না বলে
বিনিদামে ছেড়ে দিচ্ছি যা কিছু জমানো,
হাতে এখন শুধু অফুরন্ত সময়,
এখুনি তোমার না গেলে নয়,বলো?

ফলশ্রুতি

— **সুব্রত তলাপাত্র**
উদয়পুর।

এমন অনেক কাহিনী - অজানা থাকে
চারটি দেওয়াল - ঢেকে দেয় কত মুখ
সময়ান্তরে হদিস যায় না পাওয়া
কি ছিলো সেটা, দুঃখ অথবা সুখ

অন্তরঙ্গ কত মুহূর্ত- ঢাকে
ঢেকে যায় কত হিংসা ও বিদ্বেষ
অবিচারের কালখন্ড কত
থাকে না যাদের বিন্দুমাত্র রেশ

কত শত কথা বলা হয় - নির্জনে
অভিজ্ঞতার হয়ে যায় বিনিময়
নির্জীব কিছু জড় বস্তু ছাড়া
সাক্ষী তার - কে আর বলো হয়

কত অনুভূতি দরজা খুলতে চেয়ে
একান্ত মনে করে গেছে করাঘাত
তবুও কি তারা - পেরেছে খুলতে দরজা
বলতে পারে না - মূক সেই সব রাত

তবুও ব্যর্থ নয় সেই সব রাত
'না শোনা' সেই ছোট বড় কাহিনী
অলক্ষ্যে কত ছাপ রেখে চলে গেছে
ফলশ্রুতি - তার কতটুকু জানি।

দেবীশোধন

— **বিমল বণিক**
উদয়পুর।

জল আর মাছ
কি দারুন মিলন
মাঝখানে বিষ
আর গঙ্গা আনয়ন

শুদ্ধ হাতে শুদ্ধ সিদুঁর
জল যেমন বিষ
দেবী তুমি চুপ চুপ
থাকো অহর্নিশ।

তিল জল হরিতকী
মিলে মিশে ভোগ
দেবী তুমি চুপ চুপ
মেরে নাও রোজ।

আগমনী

— **মনোজিৎ ধর**
উদয়পুর।

ওঠো গো যোগেশ্বরী
বধিতে অসুর,
ফুলে ফুলে ধরণীতে
বইছে যে সুর।
দোলে কাশ মঞ্জরী
উতলা পরান ,
উঠানের কোণে জাগে
শিউলির ঘ্রাণ।
শতদল সারি সারি
অরূপ রতন,
রূপের বাহার আনে
হৃদয়ে নাচন।
দূর হোক দুর্গতি
দূর হোক কালো,
ওঠো মা মাহেশ্বরী
জ্বালাও আলো।

দুধপুষ্করিণি মৌজা হতে মেদিনীপুর

— **মৃদুল দেবরায়**
উদয়পুর।

একটি নিরাল পাখি ঘোড়াফেরা করে
সিঁড়ির নিকটে ফোটা ফুলগুলো ঘিরে
আনন্দ উপচে নামে- কি ফুল কি ফুল
চিনেছি পাগল পথে মায়াবি শেকল

তোমাকে দেখেছি আমি মৌড়িগ্রাম জুড়ে
দেখেছি জীবন এই ফুলেশ্বর জুড়ে
দুরের ট্রেনটি এল উঠল না কেউ
অধম কতটা জানে গতিপথ কথা

কেবল মনের মাথা খেয়ে আজ টি.টি
সয়েছে নীরবে স্টেশনের দিদিটিকে
ভীষণ গরম, ঝালাপালা হল কান

মালের গাড়ীটি স্থির কেনযে জানিনা

হাউর স্টেশনে বসে লিখছি এসব
দুধপুষ্করিণি মৌজা আগত বেকুব।

ধানগাছ

— **সুমন পাটারী**
বাইখোরা।

ধান কাটা হয়
ধান লাগানো হয়
এর কোনো শুরু নেই
এর কোনো শেষ নেই।

উদয়াস্ত ধান ফলছে
ফলাতে ফলাতে আমি
হয়ে উঠছি গাছ।
পায়ের পাতা ফেঁটে
বেড়িয়েছে গুচ্ছমূল

মরা কাকতাড়ুয়া বুকে নিয়ে
পাখিদের ভয় দেখাই
আবার কখনো নিজেই হয়ে যাই হাঁড়িমুখ।
চুনকালি দিয়ে চোখ এঁকে নিই
কপালে লাগাই কলঙ্কতিলক।

ঐ তিলক আমার পরিচয়
বাকি সব ভুলে আমি ধানগাছ হয়েছি।

দাগ

— **দীপ্সি দে**
আগরতলা।

পাহাড় জানে কতটা যন্ত্রণা চেপে রেখে দাঁড়িয়ে
থাকা যায়, অভিমান জমলে শেষ বিকেলে
পথচারী এসে জীবনের গল্প শোনায়,

পাহাড় শোনে সে সব কথা,
এরপর এইভাবেই ক্রমাগত আসা যাওয়ার
মাঝখানে পাহাড় শিখে যায় দাঁড়িয়ে থাকা।

ক্রমাগত দানা শস্যের হিসেব করতে করতে
মায়ের ইচ্ছে গুলি কবে পাহাড় হয়ে গেছে টের পাইনি,

একটা জীবন থেকে কিভাবে দ্রবীভূত পারদ
সব কটা মানুষের জীবনে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে
তার হিসেব আমার বাড়ির রান্না ঘরের দেওয়ালে নেই,

ছাপোশা এক জীবন কখন নিজস্ব সুর হারিয়ে
সাত সুরের মাঝে হারিয়ে গেছে তার খোঁজ মা
রাখেনি বলেই দিনশেষে হিসেবের দলিল হারিয়ে গেছে।

অস্ত যাওয়া সোনালী সন্ধ্যার ভিড়ে গোটা একটি জীবন।
এখন শুধু হিসেব করা বাকি মায়ের ত্যাগে
আমার বাড়ির উঠোনে ছড়িয়েছে কত আলো।

বিবর্তন

— **সঙ্কর্ষণ ঘোষ**
উদয়পুর।

মানুষ যখন থাকতো গুহায়
তখন তাদের কিইবা ছিলো!
কেউ ছিলোনা হিন্দু বামুন
কেউ ছিলোনা মোল্লা ইমাম
তবুও ছিলো গুহার গায়ে
ছন্নছাড়া খোদাই ছবি
পাখির পালক, গাছের পাতা
আঁকত মানুষ দেখতো যা, তা।

মানুষ যখন শিখল শিকার
তখন তাদের কিইবা ছিলো!
কেউ ছিলোনা তাবড় নেতা
কেউ ছিলোনা ভাষণ দেয়ার
তবুও ছিলো সুরের ভাষা
পৃথ্বী মায়ের ঘুম পাড়ানি
ভৈরব ছিল, পূর্বী, ইমন
ঠিক তা ছিল এখন যেমন।

মানুষ যখন জ্বালায় আগুন
তখন তাদের পোষাক গায়ে।
কেউ ছিলোনা জানিয়ে দেয়ার
কে মালিক আর কে'বা চাকর
কেউ ছিলোনা অর্থনীতির
বিভেদ বিধান বুঝিয়ে দেয়ার।
তবুও ছিলো আগুন ঘেরা
নাচের পরে গুহায় ফেরা।

মানুষ যখন জানলো কৃষি
তৈরি হল সাধের চাকা।
কেউ ছিলোনা দেশের মানুষ
সবার তখন বিশ্বনগর
মানচিত্রের মান ছিলোনা
জানের বদলা জান ছিলোনা
তবুও ছিল সমবেত, স্থির
লক্ষ্য শুধু, অগ্রগতির।

এখন মানুষ সবই জানে
সাগর থেকে চাঁদের মাটি।
এখন তাদের সবই আছে
ধর্ম থেকে অর্থনীতি
রাজনীতিও হাতে কাছে
তবুও আছে প্রানের ভীতি।
মানুষ এখন সব বুঝেছে
তখন তাদের কিইবা
ছিলো!

সূত্রপাত

— **অনিরুদ্ধ সাহা**
উদয়পুর।

সূতির কাপড়ে লেপ্টে আছে দাগ।
চাবির ছড়ায় নামের প্রথম অক্ষর।
বর্ষার আগে বিদায় নিলো বেহাগ।
কে যেন আঁকলো তোমায়! ধূসর।

তুলতুলে চোখগুলো ম্রিয়আসমান।
মেঘের প্রাধান্য চায় আশঙ্কার চাঁদ।
বিভোর যন্ত্রনা মাপে পরিমেয় গান।
সুরে সুরে শুনতে পায় শঙ্খনিনাদ।

কাপড়ের ভেতর জৈব একটি দেহ।
রঙের ফানুস উড়িয়ে দিতে ব্যস্ত।
মোরাল দেখে বোঝার উপায় নেই।
কোনটা প্রেম। কাদের হাতে অস্ত্র।

সুবোধ

— রাজীব মজুমদার
উদয়পুর।

এই সেই করতে করতে
আমার এক জীবনের প্রায়াংশ শেষ।
বরং
এক উচ্চমার্গীয় জীবন কাটিয়ে গেছে সুবোধ পাগলা।
বহুদিন আঙুলের ইশারায় মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় থামিয়ে
বুঝিয়ে দিত, সে জাতীয় সড়কের সংবিধান প্রণেতা।
আর আমি ভয়ে ভয়ে থাকি,
কখন অতর্কিতে সামনে এসে পড়ি। অসিভযুক্ত হই।

দশক আমার নব্বই, যখন পথে নেমেছিলাম।
বেশি হলে গত পরশুর কথা -
হাওয়াই হাফপ্যান্ট হাফশার্ট
একটা ছেলে মনে মনে পুষে রেখেছে, কত কি করে দেখাবে!
এই সেইু করতে করতে এই জীবনের প্রায়াংশ শেষ -
আজ নব্বই এসে ধীরে ধীরে কাল চল্লিশে পা ফেলবে।

সুবোধের দিগ্বিদিক ইশারার কথা মনে পড়ে।
আর আমার

“এই সেই ... জীবন যাপন

প্রিয় সুবোধ,
তোমার আঙুলের ইশারায় পৃথিবীতে এত এত কথা,
অথচ
আমার সমস্ত কথা কথার কথা-ই থেকে গেল।

আলোর আবাহন

— বিপাশা চক্রবর্ত্তী
উদয়পুর।

আলো, তোমারঅরুণ আভায় সাজছে শহর আবার
আনন্দ ফের আসছে ফিরে,
একঘেয়েমির সে সুর ছিঁড়ে,
বুনছে স্বপ্ন চোখের পাতায়,
বাঁধছে বাসা আশার।

নিত্যদিনের নিত্যতার বাধ ভাঙছে সে আবার ...
অনন্য তার অলীক খেলায়,
দুখের সঙ্গ ক্ষণেক ভুলায়,
চায় এ শহর দিতে ধরা
তোমার সভায় আজকে আবার।

আলো, তোমার শুভ্র আভায় মিশুক আঁধার আজ আবার
শহর ভাসুক সুরের বাণে কাটিয়ে মেঘের এই আষাঢ়।

আলো, তোমার উজলধারায়,
লাগুক পুলক সকল ব্যথায়,
সকল শর্ত ভাঙুক এ মন
সুদূঢ় পরকে করুক আপন।
ছলকে পড়ুক হৃদয়পাত্র ...
উচ্ছ্বাসে হোক বাক্যহারা,
কবির কাটুক ছন্দ-খরা!
আনন্দের এই আগমনী
গেয়ে উঠুক আজকে ধরা।

আমরা ভালো নেই

— সঞ্জীব চক্রবর্তী
উদয়পুর।

আমরা ভালো নেই,
আমরা সত্যিই ভালো নেই।
পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সব রসদ আছে,
ভরসা নেই
আমরা ভাল নেই।।

মন্দির আছে, শুচিতা নেই।
ভগবান আছে, ভক্তি নেই।
আমরা ভালো নেই।।

জমি আছে জল নেই।
চাষী আছে চাষ নেই।
আমরা ভালো নেই।।

ধর্ম আছে, ধার্মিক নেই।
মন্ত্র আছে, উচ্চারণ নেই।
আমরা ভালো নেই।।

বল আছে, বুদ্ধি নেই।
শক্তি আছে, সামর্থ নেই।
আমরা ভালো নেই।।

সম্পদ আছে, ব্যবহার নেই।
তেষ্টা আছে, শুদ্ধ জল নেই।
আমরা ভালো নেই।।

চিকিৎসক আছে, চিকিৎসা নেই।
বিজ্ঞান আছে, বিশ্বাস নেই।
সত্যি আমরা ভালো নেই।।

জীবন আছে, জীবিকা নেই।
স্বপ্ন আছে, বাস্তবায়ন নেই।
আমরা ভালো নেই।।

ভালোলাগা আছে, ভালোবাসা নেই।
শ্রদ্ধেয় আছে, শ্রদ্ধা নেই।
আমরা ভালো নেই।।

মানব আছে , মানবতা নেই,
হৃদয় আছে, অনুভূতি নেই,
সত্যিই আমরা ভালো নেই।।

কথা

— খোকন সাহা
উদয়পুর।

বলতে পারলাম কই ....
লহমায় ছেড়ে দিয়ে এসেছি,
গ্রামের নদীর ছবি।
তবে কতটা নিরাপদ আশ্রয়ে তুমি আছো।

আকাশে সব গন্ধ নতুনের।
সব রঙের ছোঁয়া আমি জানি,
আজও ক্লাসে বিজন চৌধুরী
এসে ছিল!

তার কবিতার নাম ‘সামান্য প্রার্থনা’।
সময় বদলে গেছে,
সময় এই প্রার্থনার মাঝে
আজকের খবর জানতে চায়!

উৎসব

— কল্যাণী ভট্টাচার্য
উদয়পুর।

কাশবনে দোলা লাগে শরতের হাসি
ভোরের সিগ্ধ হাওয়ায় শিউলি ভালোবাসি।
কুঁড়ি মেলে গাছগুলি কাঁপে দুরুদুরু
চারিদিকে চেয়ে দেখি শারদীয়া শুরু।
শিশির ভেজা শারদপ্রাতে স্নিগ্ধতা মনে
স্বচ্ছ শুভ্র মেঘেরা খেলে জলপদ্ম সনে ।
মেখলি পাড়ার চা বাগানে লেগেছে পূজার ধূম
খোকাখুকি বুড়োবুড়ির চোখে তে নেই ঘুম।
চারদিক জেগে উঠে সাজো সাজো রবে
মা আসছেন ঘোড়ায় চড়ে আমাদের ভবে।
আগমনীর সাতদিন পূর্বে অমাবস্যা মহালয়া
মেখলিপুর ঠাকুর ঘরে অপেক্ষায় জয়া।
দেবীপক্ষের সূচনা হয় মহালয়ার শেষে
শিবজায়া জগৎ জননী আসছেন অপূর্ব বেশে।
বছরে তে তিনটি দিন মা থাকেন ঘরে
পাড়ায় পাড়ায় কল-কোলাহল সখীরা আনন্দ করে।
ঢাকের বাদ্যির সাথে কাঁসর ঘন্টা বাজে
দলে দলে আসছে সবাই কি অপরূপ সাজে।
ঢেউ লেগেছে উৎসবেতে জেগে উঠেছে প্রাণ
মন্ডপে মন্ডপে বাহারি আলোর বান।
ধর্ম যার যার উৎসব হোক সবার!
আনন্দে ভরিয়ে দিতে এসো মা আবার।

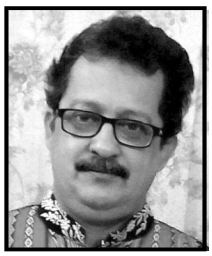

বাইশ-কথা

— পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী
উদয়পুর।

কেবলই জড়াই আরো, আরো খুঁড়ে, নিজের ভিতর,
নিজের ভিতর খুঁজি গলিঘুঁজি, গলির অন্দর,
অন্দরে প্রপাত আছে, আছে জল, জলের বন্দর,
বন্দরে বসত করে দূরগামী এক লখিন্দর।

লখিন্দর দূরে যাবে, দেবে পাড়ি, সপ্তডিঙা বেয়ে,
ডিঙা বেয়ে বাণিজ্যেতে যেতে যেতে স্বপ্নপাখা নিয়ে,
নিয়ে নেবে শঙ্খচিল, নীলমেঘ, নীলকথা চেয়ে,
চেয়ে নেবে একখানি প্রিয়তর জীবন, সময়ে।

সময়ে বেহুলা আসে, নাচে-গায়, ইন্দ্রের সভায়,
সভায় হাসেন ইন্দ্র, বেহুলাও প্রাণভিক্ষা চায়,
চায় এক লখিন্দর, ফিরে এসো, এসো এ ধারায়,
ধরাকে ধরবে বলে, প্রিয়গামী জুড়াবে হৃদয়।

হৃদয়ের কথকতা, কতো কথা, বাঁধা থাকে ঘাটে,
সেখানেই খুঁজে খুঁজে গলিঘুঁজি, মনসা-ই কাটে।

দুর্গাপুজো ও সম্প্রীতির পাহাড় সমতল

— প্রাণময় সাহা
অমরপুর।

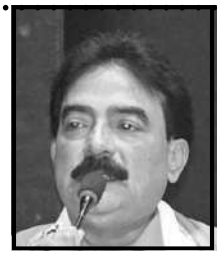

শারদীয়া দুর্গা পুজো ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি হিন্দু ধর্মাবলম্বিদের অন্যতম পূজোৎসব হয়েছে বহুকাল আগেই। এখনকার দিনে যেমন দুর্গা পূজো উপলক্ষে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে মন্ডপে মন্ডপে ঘুরে প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি ভালো-মন্দ খাওয়া-দাওয়া এটা সেটা কেনাকাটার করার মতো আরও অনেক ধরনের বিনোদন মূলক উপকরণ থাকে, আজ থেকে পঁচিশ ত্রিশ বছর আগে কিন্তু তেমনটা ছিল না। তখনকার দূর্গোৎসব মানেই সৌভাতৃত্বের অপার মেলবন্ধন যার পরিসমাপ্তি হতো বিজয়া দশমীতে একে অপরের সাথে আলিঙ্গন তথা কোলাকুলির মাধ্যমে।

১৯৮০ সালের আগে ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গা পূজা কিংবা দুগ্গা পূজো মানেই জাতি জনজাতির সম্প্রীতির মেল বন্ধনের উৎসব। দুর্গা পুজো চারটি দিন পাহার সমতল বলে কিছু থাকতো না! পাহাড় নেমে আসতো সমতলে আর সমতল ছুটতো পাহাড়ের পূজোর আনন্দ উপভোগ করতে। গোমতী জেলার জনজাতি অধ্যুষিত মিশ্র বসতি এলাকা সমূহে যেমন অমরপুরের বুরবুরিয়া, সর্বং, মালবাসা, ডালাক, অম্পিনগর, তৈদু, করবুক জলেয়া, শিলাছড়ি, ঘোড়াকাপ্পা, উদয়পুরের কিল্লা, পিত্রা, গর্জি, বাগমা ইত্যাদি অঞ্চলে বেশ ঘটা করেই দুর্গা পুজো হতো। পূজার চারটি দিন মাইকের শব্দে, ঢাকের বাদ্যে উদ্বেলিত হতো গ্রাম পাহাড়ের মানুষগুলি। মন্ডপে মন্ডপে ঘুরে নানান রকমের ফল প্রসাদ খাওয়া আর সন্ধ্যায় ধুনুচি নৃত্যে জমে উঠতো গ্রামাঞ্চলের পূজো মন্ডপগুলি। চলতো কোথাও অর্কেস্ট্রার তালে তালে উদ্যাম নৃত্য তো কোথাও রাতভর নৌকা বিলাশ, নিমাই সন্ন্যাস, রাধার মান ভঞ্জন, রাবনের সীতা হরণ, রামের বনবাস ইত্যাদি ধর্ম মূলক যাত্রাপালা। অমরপুর শহর থেকে বুরবুরিয়ায় বিপিন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ির দুর্গা পূজার প্রসাদ খেতে রাতভর যাত্রাপালা আনন্দ উপভোগ করতে পাশ্ববর্তী গ্রাম ও শহর থেকে প্রচুর মানুষ ভীর জমাত বিপিন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ির পূজোর মতো জেলার প্রত্যান্তরে গ্রামাঞ্চলের বারোয়ারি পূজো ও বাড়ির পূজো মন্ডপগুলিতে। আর বর্তমান সময়ে রাতের বেলায়তো দূরের কথা দিনের বেলাতেও প্রত্যন্তের পূজো মন্ডপগুলিতে পূর্বেকার মতো ভীর জমে না। আগেকার দিনে এক অনাবিল আনন্দের ও সম্প্রীতির অটুট বন্ধনের উৎসবে পরিণত হত পাহাড়াঞ্চলের দুর্গা পূজা মন্ডপগুলি। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় সকলের চোখের জলে মায়ের প্রতিমা বিসর্জনের পর সম্প্রীতির অটুট বন্ধন যেন আরো সুদৃঢ় হতো। পাহাড় সমতল একসুরে ঐক্যবন্ধ হতো এক বছর পরে আবার হবে এই প্রত্যাশায়। আগেকার দিনের শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে নূতন নূতন কবি, সাহিত্যিক ও গল্পকারের জন্ম হতো। আকারে ছোট হলেও মাটির গন্ধে ভরপুর গল্প, কবিতা, প্রবন্ধে সজ্জিত নূতন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিকের আবিস্কার হতো। কালের বিবর্তনে মোবাইল ইন্টারনেটের দৌলতে বর্তমান সময়ে যা একেবারেই শুধু অতীতই নয়, পুরোপুরি বিলুপ্তির পথে। রাজ্যে খ্রিষ্টান মিশনারিদের ব্যাপক ধর্মান্তকরণের জেরে এবং ১৯৭৯ সালে অমরপুর বাজারে মিজো আক্রমণ ও ১৯৮০ সালের জুন মাসে রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার বাতাবরণ তৈরি হওয়ার কারণে পরবর্তী কয়েক বছর ধরেই সমগ্র রাজ্যের সাথে গোমতী জেলার গ্রাম পাহাড়েও দুর্গা পূজা তথা শারদীয় দুর্গোৎসবে ভাটার টান লক্ষ্য করা গেছে। মিশ্র জনবসতি এলাকায় দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হলেও বন্দুকধারীদের উৎপাতে এবং তাদের ভয়ে এখন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় শারদীয় দুর্গা পুজা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় বলা চলে। গ্রাম পাহাড়ের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্প্রীতির চির ধরতে শুরু করে। ঠিক ওই সময়টাতে শহর কেন্দ্রিক শারদোৎসব নির্ভর হয়ে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ।

আলো ঝলমলে ও আলোর রোশনাইয়ে ঘিরে থাকা শহরের থিম নির্ভর গগনচুম্বী পূজো মন্ডপ, চোখ ধাঁধানো প্রতিমা তথা পুজো প্রত্যক্ষ করতে কাতারে কাতারে দর্শনার্থীরা শহরের এপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পায়ে হেঁটে গলদঘর্ম হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ঝাচকচকে প্যান্ডেল ও প্রতিমা দর্শনে একাংশ দর্শনার্থীদের চোখের খোরাক পূরণ হলেও গ্রাম পাহাড়ের পূজো গুলির মতো শহরের পূজো গুলিতে প্রানের স্পন্দন খুঁজে

পায় না মানুষ। গ্রাম পাহাড়ের মানুষ তো বটেই শহরের দর্শনার্থী সাধারণ মানুষেরা শারদীয় দুর্গা পূজোতে প্রানের স্পন্দন খুঁজতে থাকে।

২০০৮/২০১০ সাল থেকে পুনরায় গ্রাম পাহাড়ে শারদীয় দুর্গাপূজার আয়োজন শুরু হয়। শহরের মত আলোর ঝলকানিতে, মন্ডপ মূর্তির চাকচিক্য কিংবা জৌলশ না থাকলেও চারদিন ব্যাপী গ্রাম পাহাড়ের পূজোগুলিতে প্রানের স্পন্দন ফিরে পেতে শুরু করে। জাতি জনজাতির মধ্যে ভেঙ্গে পরা সম্প্রীতির মেল বন্ধনে গ্রাম পাহাড়ের শারদীয় দুর্গাপূজা এক অনন্য ভূমিকা নেয়। শুরু পাহাড় সমতল সর্বত্র বারোয়ারি দুর্গা পুজো। জাতি জনজাতি উভয় অংশের মানুষের চাঁদা সংগ্রহ করে যেমন করবুক বাজারে, কিল্লাতে, শিলাছড়িতে, অম্পিনগরে ও তৈদুতে দূর্গোৎসবে মেতে উঠেন তেমনি মিঞার বাজারে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দূর্গা মায়ের পুজো করে চলছেন জাঁকজমক পূর্ণ ভাবেই। তারমধ্যেই আবার করোনার থাবায় দুই দুটি বছর পূজোর আনন্দে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটলেও গেল বছর থেকেই ছন্দে ফিরেছে শারদীয় দুর্গোৎসব। সমগ্র রাজ্যেই পুজোর আয়োজন অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরেই গ্রাম পাহাড়ের পূজো গুলির মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো চোখ ধাঁধানো জাঁকজমক বিহীন নিয়মের পূজো অনুষ্ঠান। পূজোর চারদিনের মধ্যে একদিন, বিশেষ করে অষ্টমী পূজোর দুপুরে প্রায় প্রতি পূজো মন্ডপেই অন্নভোগের আয়োজন থাকে যার যার এলাকা ভিত্তিক। অষ্টমী দুপুরে সকলে মিলে পাতাপেতে অন্নভোগ খাওয়ার যে কি অনাবিল আনন্দ, কি অনন্য সাধারণ তৃপ্তি তা লিখে বোঝানোর সাধ্য এই কলমচির নেই। ওটাই হয়তো ভাতৃত্ববোধ। সৌভাতৃত্বের মেল বন্ধন। তবে সারা বছরের মধ্যে চারদিনের শারদীয় দুর্গোৎসব এরাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে তথা পাহাড় সমতলের বাসিন্দাদের মধ্যে দূরত্ব ঘুছিয়ে সম্প্রীতির সোপান হয়ে উঠেছে বলা যেতেই পারে। মিলনের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠুক ত্রিপুরা, এরাজ্যের আপামর জনসাধারণ মনে প্রানে তাই চায় । কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগত এবং দলগত লাভা লাভের প্রশ্নে রাজ্যের নিরীহ মানুষগুলি কে ব্যবহার করে সৌভাতৃত্ব ও সম্প্রীতির মেল বন্ধনে বার বার আঘাত হেনেছে। কিছুটা দেরি হলেও মানুষ বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারে বারে প্রতিবারে। এবারের শারদীয় দূর্গোৎসব সমগ্র রাজ্যের সাথে গোমতী জেলাতেও জাতি জনজাতি, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উৎসবে পরিণত হোক। এই প্রত্যাশাই থাকবে জেলার সকল অংশের মানুষদের নিকট।

আমেদের উৎসব

ডাঃ অভিজিৎ দত্ত।

বর্ষাক্লান্ত আকাশে শারদীয় পদধ্বনি। কালো মেঘ কাটিয়ে নির্মল আকাশে খুঁজি আগমনীর বার্তা। শীতের হালকা কুয়াশা ভেজা ঘাস মনে করিয়ে দেয় ছেলেবেলা। কিশোর বয়সের নানা স্মৃতি। কত আনন্দ আর স্বপ্ন মাখা ছিল সেসব দিন। মনে পড়লেই নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হই। প্রৌঢ়াত্বে এসে আরোও যেন বেশী বেশী করে আবিষ্ট হই সেদিনের শারদ আয়োজনে। অতীতের বহু ঘটনা এখনো আমাদের উদীপ্ত করে। পাশাপাশি বর্তমান সময়ের নানা ক্রিয়াকলাপ অমূলক ভয়ের জন্ম দেয়। আমাদের সংগঠন হেপাটাটিস ফাউন্ডেশন এই ভয়ের (!) বিরুদ্ধে একপ্রকার যুদ্ধ ঘোষনা করেছে। হ্যাঁ যুদ্ধই বলবো কারণ আমাদের প্রতিপক্ষ তার বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে গোটা সমাজটাকে গিলে খেতে চাইছে। বিশেষ করে আমাদের কিশোর-যুবদের ভবিষ্যত প্রশ্নের মুখে? আপনারা মনে মনে ঠিক বুঝেছেন, আমি বলতে চাইছি নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা আগামী প্রজন্মের কথা। সঙ্গে রয়েছে মারণ রোগের সংযুক্তি। যদিও এখন পর্যন্ত একটা ছোট অংশই একাজে জড়িত। আমরা সবাই মিলে রাজ্যের মানসিক, শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে যদি ইতিবাচক, আন্তরিক প্রয়াস গ্রহণ করি তাহলে পথভোলাদের বৃহত্তর সমাজের যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারবোই। এবারের শারদ আয়োজন থেকেই আমাদের আগামী উৎসব ভাবনার পুরোদস্তুর কর্মপ্রয়াস শুরু হোক।

"সর্বে ভবন্তু সুখিনো সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যান্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ ভবেৎ।।"

উৎসবের আলো!

পার্থপ্রতিম সাহা

দীর্ঘবছর ধরেই সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত আছি। তাই যেখানেই যাই চোখ থাকে কোন খবর আছে কিনা। মাঝে মাঝে অন্যদের চোখেও খবর আমরা দেখি। সেরকম একটি ঘটনা দেখতে পায় আমার এক ছোট ভাই। সে জানায় বছর ছয়,সাতেকের একটি শিশু মাথায় করে কিছু নিয়ে যাচ্ছে। তার বাড়ী কোথায়, কে কে আছে ইত্যাদি খোঁজখবর করে। তার কথামত আমাদের সংগঠনের অভিভাবক দুলুকাকুকে সঙ্গে নিয়ে ওই শিশুটির ছনবন সুভাষ সেতু সংলগ্ন বাড়ীতে যাই। এক হৃদয় বিদারক ঘটনা। যে বয়সে স্কুলের ব্যাগ পিঠে থাকার সে বয়সেই পিঠে উঠেছে জীবনের বোঝা। যে পা মাঠে ছুটতো তা ছোটে আমার আপনার পরিচিত অপরিচিত রাস্তা বা গলিতে। যে জীবন সহপাঠীদের সংগে আনন্দে উদযাপন করার কথা ছিল তাতে জমে উঠেছে যন্ত্রনা। আর তাতেই ছ'বছর বয়সের আরিফ যেন হয়ে গেছে ষাট বছরের বৃদ্ধ। কথা বলেছিলাম আরিফ আলীকে নিয়ে। বাবা রমজান আলি পেশায় রিক্সা চালক। কিন্তু সেই রিক্সার মোটর চুরি হয়ে যাওয়ায় রোজগার বন্ধ। এখন যা পান সে কাজই করেন। তাতে সংসার চালানো কঠিন। এজন্যই দিদি শিল্পী বেগম, ভাই আরিফ আর নানি তিনজন মিলে বোতল কুড়িয়ে বাড়তি আয়ের জন্য চেষ্টা করে। বহু কষ্টে হয়তো খাবার জুটে যাচ্ছে, কিন্তু ওদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। এই চরম দুর্দিনে দুটি শিশুর মা সোহেলা বিবি নিজের সুখ খুঁজতে সবাইকে ফেলে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে? এ নিয়ে ব্যাথা থাকলেও তা মানিয়ে নিয়েছে সবাই। এখানে যদি কথা শেষ হয়ে যেতো তাহলে কিছু বলার ছিল না। এত কষ্ট দারিদ্রের মাঝেও আরিফ ও শিল্পী পড়তে চায়। শিক্ষা অধিকার আইনে ওদের সেই সুযোগও রয়েছে। কিন্তু কে ওদের এই সুযোগ করে দেবেন? উৎসবের আলো ওদের পরিবারকেও সামান্য আলোকিত করবে কিনা তা সময় বলবে।

টেলি মানস

ডাঃ উদয়ন মজুমদার
উদয়পুর।

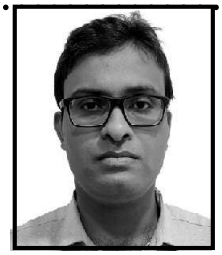

টেলি মানস-এর পটভূমি ঃ—

মানসিক স্বাস্থ্য ছাড়া কোন স্বাস্থ্য নেই। কোভিড ১৯ মহামারী চলাকালীন, ভারত সরকার মহামারী চলাকালীন মনোসামাজিক সহায়তা প্রদানের জন্য একটি জাতীয় মনোসামাজিক সহায়তা হেল্পলাইন চালু করেছে এবং সারাদেশে ৬ লক্ষেরও বেশি ব্যক্তি হেল্পলাইনের সাথে যোগাযোগ করেছে।

টেলি-মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োগ চালিয়ে যাওয়ার দিকে এক একটি পদক্ষেপ বৃহৎ পরিসরে পরিষেবা হল ন্যাশনাল টেলি-মেন্টাল হেলথ প্রোগ্রাম বা টেলি মানস (টেলি-মেন্টাল হেলথ অ্যাসিসট্যান্স অ্যাণ্ড নেটওয়ার্কিং অ্যাক্রোস স্টেট)

কেন্দ্রীয় বাজেটে (২০২২ - ২০২৩), ভারত সরকার ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশের ২৩টি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের ঘোষণা করেছিল, যার মধ্যে নিমহান্স, বেঙ্গালুরুকে টেলি মানস চালু করার জন্য শীর্ষ নোডাল কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

টেলি-মানস অডিও এবং ভিডিও ভিত্তিক উভয় পরিষেবা সহ একটি সমন্বিত ফ্যাশনে প্রযুক্তির সুবিধা নিতে এবং ব্যাপক মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করতে চায়।

টেলি মানস চালু ঃ—

টেলি মানস ১০ই অক্টোবর, ২০২২-এ বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে দেশব্যাপী চালু করা হয়েছিল এবং ত্রিপুরায় এটি ১৬ জানুয়ারী, ২০২৩-এ নরসিংগড়ের আধুনিক মনোরোগ হাসপাতালে চালু হয়েছিল।

টেলি মানস-এর উদ্দেশ্য ঃ—

১) একটি টেলি-মেন্টাল হেলথ নেটওয়ার্ক সাপোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য এবং সময়মত মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২) টেলি মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং সহ সম্প্রদায়ে পরিষেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা।

৩) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা / স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র / জেলা / রাজ্য / শীর্ষ প্রতিষ্ঠান স্তরে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ক্ষমতা এবং নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি করা।

টেলি মানসের সুবিধাভোগী ঃ—

ভারতে যে কোনো ব্যক্তি যাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে।

টেলি মানস পরিষেবাগুলির উপাদান ঃ—

১) অনলাইন কাউন্সেলিং।

২) টেলিফোন কাউন্সেলিং।

৩) ভিডিও পরামর্শ।

৪) মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ব্যক্তিগত সম্পদের সাথে নেটওয়ার্কিং।

৫) সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৬) গবেষণা।

উপসংহার ঃ—

এটি টোল ফ্রি নম্বর ১৪৪১৬ / ১৮০০-৮৯১-৪৪১৬ এর মাধ্যমে সারা দেশে বিনামূল্যে টেলি মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে।

মোবাইলগ্রস্থ শৈশব-কৈশোর !

— ডাঃ সঞ্জয় আইন
উদয়পুর।

বর্তমানে শিশুদের সিংহভাগ সময় দখল করে নিয়েছে স্মার্টফোন এখন শিশুরা সাধারণত মোবাইল, টেলিভিশন, স্মার্টফোন, ট্যাব হটনিউবে সময় কাটায়। বিশেষ করে লক ডাউনের পর থেকে এই প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই প্রযুক্তির অতি ব্যবহারের ফলে বর্তমান প্রজন্ম হারাচ্ছে নিজেদের চিন্তা, ভাবনা, প্রকৃতির রসদ। প্রযুক্তির এই সব পণ্য থেকে নতুন প্রজন্মকে দূরে রাখার জন্য দেশে দেশে অভিভাবকেরা উদ্যোগ নিচ্ছেন। বিশেষ করে বহির্বিশ্বের অনেক দেশেই স্কুলে মোবাইল ফোন ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

প্রায়ই দেখা যায়, অভিভাবকেরা বাচ্চাকে শান্ত রাখার জন্য তার হাতে স্মার্টফোন বা ট্যাব ধরিয়ে দেয়। গান, কার্টুন বা মজার ভিডিও চালিয়ে দিয়ে তাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেন। আপনার, আমার সবার বাসাতেই এই চিত্র এখন নিত্যদিনের। স্মার্ট ফোনের কল্যাণে হয়তোবা বাচ্চাদের খুব সহজেই শান্ত রাখা, খাওয়ানো এমনকি বর্ণমালা ও ছড়া শেখানো যায় কিন্তু বিপরীতে নিজের অজান্তে শিশুদের পঙ্গু করে তুলছি।

বড়দের উদাসীনতার কারণে ছোট বাচ্চারা মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়ছে, যার প্রভাব ও কুফল ভয়ংকর। শিশুরা ফোন চাইলেই দিতে হবে, এটা নিশ্চয়ই স্মার্টনেস নয়। আমরা বড়োরা যেভাবে দিন এর পর দিন এই মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি শিশুরাও আমাদের দেখে সে শিক্ষাটাই গ্রহণ করছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সন্তানের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দেওয়ার অর্থ হলো তাদের হাতে এক বোতল মদ তুলে দেওয়া। কারণ স্মার্টফোনের আসক্তি মাদকাসক্তির মতোই বিপদজনক। যার ফলে শিশুরা যেমন

শিক্ষাক্ষেত্রে অমনোযোগী হচ্ছে তেমনি স্বাস্থ্যও খারাপ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে অনেক শিশু খুব অল্প বয়সেই নানা ধরণের অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। বলা হয়ে থাকে "আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ" আর এই ফুটন্তপুষ্পকে আমাদের অজ্ঞতার কারণে বিষদানে হত্যা করছি।

আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। আর এই প্রবাদটি বলার কারণ হল একটা সময় ছিলো যখন পরিবারের সবাই মিলে আড্ডায় মেতে উঠতো, বন্ধু-বান্ধব একসঙ্গে খেলাধূলা করতো, শিশুরা নিজে নিজে ছড়া আবৃত্তি করতো, গল্পের বই পড়তো, প্রতিদিনকার ঘটনাবলি ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করতো, যৌবন সমাজের কাজে, অপরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পরতো। কিন্তু এখনকার দৃশ্যপট ভিন্ন। স্মার্টফোনের আসক্তি থেকে বাচ্চাদের কিভাবে সরাবেন বা আপনি কী করবেন?

১) আপনার শিশুকে ঘরবন্দি না করে পাড়ার সাথীদের সাথে খেলতে দিন।

২) শিশুকে আরও বেশী বেশী করে সময় দিন। কর্মব্যস্ততার নামে হাতে ফোন ধরিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

৩) শিশুদের ছবি আঁকা, গান গাওয়া বা কোনও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি কৌতুহল থাকলে সেই আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দিন।

৪) মাঝে মাঝে আপনার শিশুর মনে আনন্দ সঞ্চারের জন্য বেড়াতে নিয়ে যান।

সবশেষে আমি আরো একটি জিনিসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাই যে, শিশুদের ছোটবেলা থেকেই মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে। তারা যেন 'শ্রেয়' এবং 'প্রেয়' এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। তারা যেন বুঝতে পারে পড়াশুনার সময় আমাকে পড়াশুনা করতে হবে। খেলার সময় আমাকে খেলাধূলা করতে হবে এবং মোবাইল দেখারও একটি সময় নির্দিষ্ট থাকবে। তাহলেই হবে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবস্থা এবং তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও থাকবে সুরক্ষিত।

আমার চিন্ময়ী মা

— **কার্তিক দেবনাথ**
উদয়পুর।

মৃন্মময়ী মায়ের পূজা করে সবাই
মনের আনন্দে ধুমধাম করে,
আমার চিন্ময়ী মা কাঁদে ঘরে বসে
দেখে দু'চোখ আসে জলে ভরে।

মাটির প্রতিমা কখনো কয়না কথা
তবু তাকে নিয়ে কত মাতামাতি,
আমার মায়ের মতো কতো মায়েরা
খেতে না পেরে পাল্টে যায় রাতারাতি।

দেবী পার্বতী কৈলাশ থেকে আসে
ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে,
চিন্ময়ী মায়েরা তাদের সন্তানকে পাঠায়
ছেঁড়া জামা কাপড় পরিয়ে দিয়ে।

বলো, কিবা দোষ আমার চিন্ময়ী মায়ের
দুবেলা দুমুঠো খেতে না পায়,
আমার মুখের খাবার জোগাড় করতে
অন্যের বাসায় বাসন মাজতে যায়।

বাসি খাবার যেগুলো মালিকেরা
ফেলে দিতে মাকে বলে,
লুকিয়ে সেগুলো মা নিয়ে আসে
আমাকে খেতে দেবে বলে।

কতো আনন্দ আজি পুজোর দিনে
আলোয় ঝলমল করে,
আমার মাকে কতো বলি যেতে
দুচোখে শুধু অশ্রু ঝরে।

মালিকেরা তিনদিন জ্বালায় না উনুন
হোটেলে রেস্তোরায় খায়,
আমাদের ঘরে ও জ্বলেনা উনুন
দোষ দেয় শুধু বিধাতায়।

পূজার দিনেও মায়ের জোটেনা ছুটি
কাজ করতে যেতে হবে,
মালিকের মন খুশি না হলে
পরের দিনই কাজ যাবে চলে।

মৃন্ময়ী মাগো প্রণমী তোমার চরণে
মায়ের দুঃখ দূর করতে শক্তি দিও,
আমার চিন্ময়ী মায়ের অশ্রুধারা
তোমার আঁচলে মুছায়ে নিও।

আগমনী

— **সুব্রত আচার্য্য**
খোয়াই।

দিকে দিকে কাশ ফুল আর
শিউলী ফুল ফুটে উঠেছে।
মা দুর্গা দুর্গতী নাশিনীর
আগমনী বার্তা বয়ে এনেছে।

শ্রাবনের জল ধারায় ধৌত
পথ ঘাট আজ জঞ্জাল মুক্ত।
শরৎ এর হিম স্পর্শ নির্মলবায়ু
প্রবাহিত কিছুটা শিণি যুক্ত।

মেঘ মুক্ত অপরূপ আকাশটা
আজ নীল শোভা বর্ধন করছে।
দেবীপক্ষ সুচনা হবে তাই যেন
প্রকৃতিও নব রূপে সেজেছে।

তুমি মাতা মহামায়া জগৎ জননী
জীবের কল্যানে দাও সারা এসে।
সকল অশুভ শক্তি ধ্বংস কর মাগো
সুখ শান্তিতে থাকুক সকলে তব আশিসে।

রাজধানীর বনেদী পুজো

— দেবী চক্রবর্ত্তী
আগরতলা।

বাঙালীর বারোমাসের তের পার্বণ থাকে। এই তের পার্বনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পার্বণ হল দুর্গাপূজা। 'পার্বণ' কথার অর্থ হল 'উৎসব'। শরৎকালে এইপূজা হয় বলে একে শারদীয়া পূজা বলা হয়। কেবল ত্রিপুরাও পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা বিশ্বের বাঙালীরা মেতে উঠে দুর্গোৎসবের আনন্দে। সাবা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুজা অত্যন্ত সাড়া জাগানো।

আগরতলা শহরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পূজা ৫০০ বছরের পুরানো দুর্গাবাড়ীর পূজা। মহাসপ্তমীর পুন্যলগ্নে আগরতলায় ঐতিহ্যবাহী দুর্গাবাড়ীতে সপ্তমী পুজা আরম্ভ হয়। প্রথা মেনে নবপত্রিকা স্নান করে শুরু হয় পূজা। আগরতলার এই পূজা একটু ব্যতিক্রমী। মা দুর্গার দুই হাত থাকে এবং দুর্গাবাড়ীর পূজা সরকারী নিয়মানুযায়ী দশমীর রাতে বিশেষ মর্যাদায় বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। দূর্গাবাড়ীর মূর্তির আগে থাকে প্রভুরবাড়ী মূর্তি এবং এই দুই মূর্তি একসাথে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমন করে হাওড়া নদীতে বিসর্জিত হয়।

রাজধানী আগরতলায় বড় ক্লাবগুলিতে প্যান্ডেলে থাকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের থিম। প্যান্ডেল ও মূর্তি তৈরীর শিল্পী আবার কখনো ত্রিপুরার বাইরে থেকেও আনা হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসেন মূর্তি গড়ার শিল্পী, বিভিন্ন দপ্তর থেকে বা মিডিয়া থেকে ক্লাবগুলিকে বাছাই করে কয়েকটি বিষয়কে মাথায় রেখে সেরা মূর্তি, সেরা মন্ডপসজ্জা ইত্যাদি শারদ উপহার দেওয়া হয়। প্রায় প্রতিটি প্যান্ডেলের সামনে সামাজিক সচেতনতা নিয়ে বিভিন্ন বার্তা দেওয়া হয়। আবার কখনোও ভিডিও প্রদর্শনী করা হয় যেমন -পনপ্রথা, নেশার কুফল, বৃদ্ধাশ্রম, কন্যা সন্তানের সুরক্ষা, নিয়ে বিভিন্ন বার্তা দেওয়া হয়। যেমন পনপ্রথা, নেশার কুফল, বৃদ্ধাশ্রম, কন্যা সন্তানের সুরক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ক কাহিনী ইত্যাদি । আজকাল সন্ধ্যার তুলনায় রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূজার প্যান্ডেলগুলিতে ভীড় বাড়তে থাকে। এর মধ্যেই থাকে হরেক রকমের মেলা, আর ভিন্ন স্বাদের খাবার জিনিসের দোকান। মানুষকে সচেতন করার একটি বিশেষ জায়গা হল পূজোর প্যান্ডেলগুলিতে যেখানে লোকের সমাগম হয় সেই জায়গাটি। বর্তমানে আগরতলা পূজার বিশেষত্ব হল দশমীর পরে ''কার্নিভাল''। যেখানে মূর্তিগুলি একত্রিত হয়ে বিসর্জনের জন্য হাওড়া নদীর দিকে এগিয়ে চলে। এই এগিয়ে যাওয়া আমাদের মধ্যে নতুন জীবনের বার্তা দিয়ে যায়।

উৎসব ও কাঁটাতার

— **স্নেহাশীষ চক্রবর্তী**
বিলোনীয়া।

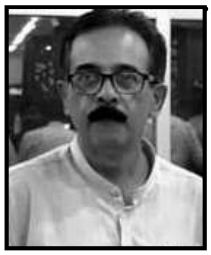

উৎসব মুছে দেয় কাঁটাতারের সীমান্ত বেড়া, হে সত্যি তাই একমাত্র উৎসবই মুছে দিতে পারে সীমান্তের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হায়না রুপী কাঁটাতারে বেষ্টিত বেরিকেডকে, আমাদের এই বিশাল ভারতবর্ষে নানা ভাষাভাষী মানুষের বসবাস, তাঁদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও আলাদা, তাঁদের আচার আচরণ বেশ ভুসা ও আলাদা, শিক্ষা দীক্ষা তাও আলাদা, কিন্তু সেই আলাদার মাঝে আমরা সবাই এক আমরা ভারতবাসি, আমরা সব ধর্মের মানুষ আমরা নিজের নিজের মত কোরে উৎসব পালন করি এবং সেই উৎসবে আমরা সামিল হই আর সেই উৎসবগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎসব অবশই বাঙালির দুর্গোৎসব, এই উৎসবে সব ধর্মের বর্ণের মানুষ মিলে মিশে একাকার হয়ে জান, সেই দুর্গোৎসবে, দুর্গাপূজার কার্ণিভাল ও পাড়ায়, পাড়ায়, ক্লাবে, ক্লাবে অসংখ্য দুর্গোৎসব এর প্রমাণ। কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন অর্থাৎ বাঙালি উৎসব প্রিয় জাতি। সবার সাথে মিলেমিশে সদ্ভাবে থাকাই বাঙালির সংস্কৃতি। এখানে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। এই উৎসবে সীমান্তের এপার ওপার দুপারের মানুষ এই উৎসব মুখড়িত দিনগুলিতে ম্রিয়মান থাকেন, কাঁটাতারের সীমান্ত বেড়া সেই মলিনতাকে যেন আরো উস্কে দে, কিছুতেই সেই কাঁটাতার রূপী হায়না চায় না দুপারের মানুষগুলোর মধুর মিলন, চায় শুধু বিচ্ছেদ। এইসময় সকল জাতি, উপজাতি সব অংশের মানুষ চায় মিলেমিশে, প্রাণখোলা, মনভোলা আনন্দ উৎসবে মেতে থাকতে, আর এটা যদি করতে পারতো তাহলেই হতো উৎসব পালনের সার্থকতা। নজরুলের বিখ্যাত কবিতার একটি পংতি এখানে খুবই প্রজজ্য আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু তার নয়নমনি মুসলিম তার প্রাণ, অথচ এই বঙ্গভঙ্গের মধ্যে দিয়ে দুটি প্রাণকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া হলো। ভারত ভঙ্গের সময় বঙ্গভঙ্গ হলো ভাগ হলো ত্রিপুরা। পরে স্বাধীন বাংলাদেশ হলেও ভাই, ভাই, বোন বোন, আত্মীয় স্বজন দু'দেশে ভাগ হয়ে গেলাম, এযেন নিজভূমে ছিন্নবাসী, পরবাসী এর মতো অবস্থা। আবার মরার উপরে খাঁড়ার ঘা এর মতো বুকে চেপে বসলো কাঁটাতার সীমান্তবেড়া। এ যেন একই পরিবারের মাঝে বিবাদ হলে যেমন উঠোনের মাঝে দেয়াল তুলে দিয়ে পৃথক করা হয়, ঠিক তেমন। কিন্তু আমাদের মধ্যেতো কোন বিরোধ নেই, বিবাদ নেই। তাই এই কাঁটাতার আমাদের বুকে কাঁটার মতো বিঁধে আছে। এই কাঁটাতার সীমান্তবেড়ার জন্য বিমর্ষ, হতাশ, মলিন।

নদীর এপার-ওপারেও নৌকোতে পারাপার হয়, নদী গ্রামকে, শহরকে ভেঙে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনা। কিন্তু কাঁটাতার সীমান্ত বেড়া আমাদের আপনজনদের থেকে আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, পৃথক করেছে। এতে সব উৎসবের আনন্দ মুছে গেল, ম্লান হলো, সীমিত হলো, সংকুচিত হলো।

রাখিবন্ধন, ঈদ, মহরম, দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, পয়লা বৈশাখ, ... কত কত উৎসব আমরা মিলেমিশে পালন করতাম কিন্তু সীমান্তবেড়া যেন তা চায়না। ‘‘ধনধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সেদেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা’’।

কিন্তু কাঁটাতারের সীমান্ত বেড়া আমাদের স্বপ্নখুলোকে স্মৃতিগুলোকে, মনকে, প্রাণকে যেন খাঁচাবন্দী করে রেখেছে। সীমান্তবেড়া ডিঙিয়ে পাখীদের মতো আমাদের ওপারে উড়ে যেতে ইচ্ছে হয়, পশুদের মতো ইচ্ছে হয় কাঁটাতার ভেঙে ফেলতে। আমরা মানুষে মানুষে মহামিলন চাই, উৎসবে উৎসবে সে সুযোগ পাই।

হে ঈশ্বর, তুমি সকলকে শুভবুদ্ধি দাও, উদারতা দাও, কাঁটাতার সীমান্ত বেড়া তুলে দাও।

যখন ভাবি, শুধু ভাবি -
মিশে যাবো সকলের সাথে,
কাঁটাতার দাঁত বের করে হাসে, আর
ভালোবাসা গুমরে গুমরে কাঁদে
মায়ের বুক ভাগ করা এই কাঁটাতারের সীমান্তবেড়া আমাদের সকল উৎসবকে মুছে দেয়, ম্লান করে দেয়। আমরা মানবতা চাই, মহামিলন চাই, উৎসবে অনাবিল আনন্দ চাই।

কিশোরী বিবাহ এবং গর্ভাবস্থার ক্ষতিকারক প্রভাব

ডাঃ অর্জুন সাহা
উদয়পুর।

বাল্যবিবাহ ও গর্ভধারণ একটি সামাজিক অভিশাপ। বাল্যবিবাহের নিষেধাজ্ঞা (সংশোধন) বিল, ২০২১ একুশ বছর বয়সের আগে একটি মেয়ে বা ছেলের বাল্যবিবাহকে সংজ্ঞায়িত করে এবং আনুষ্ঠানিক বিয়ে এবং অনানুষ্ঠানিক মিলন উভয়কেই বোঝায় যেখানে ২১ বছরের কম বয়সী শিশুরা বিবাহিতের মতো সঙ্গীর সাথে থাকে। বাল্যবিবাহ শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন করে এবং তাদের সহিংসতা, শোষণ এবং অপব্যবহারের উচ্চ ঝুঁকিতে রাখে। বাল্যবিবাহ মেয়ে এবং ছেলে উভয়কেই প্রভাবিত করে, তবে এটি মেয়েদেরকে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে। বাল্যবিবাহে বাল্যকাল শেষ হয়। এটি শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার অধিকারকে নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করে। এই পরিণতিগুলি শুধুমাত্র মেয়েটিকে সরাসরি প্রভাবিত করে না, তার পরিবার এবং সম্প্রদায়কেও প্রভাবিত করে। একটি মেয়ে যে ছোটবেলায় বিবাহিত হয় তাকে স্কুলের বাইরে থাকা, খেলাধুলা, নিজের মত করে বড় হয়ে উঠা, অর্থ উপার্জন না করা এবং সম্প্রদায়ে অবদান না রাখা - এইসব সম্ভাবনাগুলি থেকে বঞ্চিত করে রাখে। তার গার্হস্থ্য সহিংসতার সম্মুখীন হওয়ার এবং HIV/AIDS -এ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সে যখন শিশু থাকে তখন তার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এটি একটি মেয়ের জন্য মারাত্মক।

বাল্য বিবাহের ফলে মেয়েরা তাদের জীবদ্দশায় আরও বেশি সন্তান ধারণ করে। এতে পরিবারের উপর অর্থনৈতিক বোঝা বাড়তে পারে। যার জন্য হয়তোবা এই মেয়েটি মোটেই দায়ী নয়। অনুমান বলছে যে প্রতি বছর, ভারতে ১৮বছরের কম বয়সী কমপক্ষে ১.৫ মিলিয়ন মেয়ের বিয়ে হয়। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী প্রায় ১৬ শতাংশ কিশোরী বর্তমানে বিবাহিত। ২০০৫-২০০৬ এবং ২০১৫-২০১৬ -এর মধ্যে ১৮বছর বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে করার প্রবণতা ৪৭ শতাংশ থেকে ১৭ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে এটাও কম নয়। এটা সবাই মিলে শূন্যের কোটায় গুনতে হবে। সবাইকে সচেতন হয়ে একযোগে কাজ করতে হবে। যাতে ১৮ বছর বয়সের নীচে কোন মেয়ের বিয়ে না হয়। বরং আমি তো বলব ১৮ বছর কেন, একটি মেয়েকে উপযুক্ত পথ নির্দেশনা ও সাপোর্টের মাধ্যমে তাকে নিজের মত করে মানুষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে দেওয়া উচিত। NFHS-৫ সমীক্ষা অনুযায়ী ২০-২৪ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে দেখা গেছে যে উনাদের ৪০% এরও বেশি মহিলা তাদের ভোট দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার অর্থাৎ ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে।

এখন কিশোরী বিবাহ হল কিশোররী গর্ভাবস্থার একটি এবং একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কারণ। কিশোরী গর্ভাবস্থা মা এবং শিশুর জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেন ফান্ড (ইউনিসেফ) "কিশোরী গর্ভাবস্থা সংজ্ঞায়িত করে যখন একটি কিশোরী ১৩-১৯ বছর বয়সের মধ্যে গর্ভবতী হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে গর্ভাবস্থা একটি ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা কারণ একটি কিশোরীর শরীর তখনও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রজননের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত নয়। বিশ্বব্যাপী গত দুই দশকে কিশোর-কিশোরী-নির্দিষ্ট প্রজনন হারে ১১.৬%হারে উল্লেখযোগ্য পতন সত্বেও, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ১৫-১৯ বছর বয়সী আনুমানিক ২১ মিলিয়ন মেয়ে গর্ভবতী হয়। ওয়াল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অনুমান করে যে মোট জন্মের প্রায় ১১% বিয়ে ২০বছরের কম বয়সী মহিলাদের মধ্যে ঘটেছে এবং এই জন্মের ৯৫%নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে ঘটেছে, সাধারণত সবচেয়ে প্রতিকূল কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে -৫ এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ত্রিপুরা এবং গোমতী জেলায় কিশোরী গর্ভধারণের হার ১৮.৮% থেকে বেড়ে ২১.৯% হয়েছে। টিনএজ গর্ভাবস্থা একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে ঘটার সম্ভাবনা বেশি, সাধারণত দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের কারণে। এটি মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু, এবং অসুস্থ-স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের আন্তঃপ্রজন্মীয় চক্রের একটি

প্রধান অবদানকারী। কিশোরী গর্ভাবস্থা একটি উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা যা মা এবং শিশু উভয়ের স্বাস্থ্যকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। যদিও ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের (RGI) স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (এসআরএস) রিপোর্ট অনুসারে, মায়ের মৃত্যুর হার (এমএমআর) ২০১৫-১৭ সালে ৮.১ থেকে ২০১৬-১৮ সালে ৭.৩ এ কমেছে এবং শিশু মৃত্যুর হার (IMR)ও কমেছে।

বয়ঃসন্ধিকাল জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় যেখানে একটি শিশু যৌন এবং মানসিক পরিপক্কতার মধ্য দিয়ে যায়। যৌন পরিপক্কতার সাথে বয়ঃসন্ধির সূচনা তাদের শরীর অন্বেষণের বিষয়ে কৌতূহলী করে তোলে, যার ফলে ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রাথমিক যৌন সূচনা কিশোর -কিশোরীদের অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ ঝুঁকি বাড়ায়। প্রমাণ আরও ইঙ্গিত করে যে যৌনতা, গর্ভধারণ, প্রজনন স্বাস্থ্য, গর্ভাবস্থা এবং গর্ভনিরোধ পদ্ধতি সম্পর্কে ভুল ধারণা এবং ভুল বোঝাবুঝিসহ অনিরাপদ যৌন অনুশীলনগুলি কিশোরী গর্ভাবস্থার প্রধান কারণ। কিশোর বয়সে জন্ম প্রতিকূল গর্ভাবস্থার ফলাফলের জন্য একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ এবং এটি শিশুর পাশাপাশি মায়ের ভবিষ্যতের সুস্থতার উপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কিশোরী গর্ভাবস্থার প্রতিকূল মাতৃত্বকালীন এবং প্রসবকালীন ফলাফলগুলি নিম্ন ও উচ্চ আয়ের দেশগুলিতে কম জন্মের ওজন (জন্মের ওজন কম ২.৫কেজি), প্রিটার্স ডেলিভারি, প্রসবকালীন মৃত্যু, মাতৃমৃত্যু এবং নবজাতকের অ্যাসফিক্সিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ভালভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

বেশ কিছু পূর্ববর্তী গবেষণাও নিশ্চিত করেছে যে বিবাহিত এবং অবিবাহিত কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে কিশোরী গর্ভাবস্থার সামাজিক পরিণতির অভিজ্ঞতা ভিন্ন হলেও, প্রধান অন্তর্নিহিত কারণগুলি একই; বোঝার অভাব এবং অনিরাপদ যৌন অনুশীলন। বিয়ের আগে অবাঞ্ছিত গর্ভাবস্থা প্রায়শই ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্ম দেয় এবং গর্ভবতী বা কিশোরী প্রসবের জন্য আজীবন ঝুঁকি বাড়ায়। প্রথমিক কারণ হল সঠিক বোঝার অভাব।